আমার সমগ্র ধরা,
তোমাতে হউক ভরা,
তোমাতেই দিব আমি সঁপিয়া জীবন
তোমারি বিশাল ঘরে,
ভুলি গিয়া পরাপরে,
সেবিব যতনে সবে তোমারি কারণ,
তোমারি কল্যাণ ক্ষেম,
অনন্ত অপার প্রেম,
হোক এই দীন প্রাণে রত্ন আভরণ,
পুরাও কামনা, কর সার্থক জীবন।

শ্রীমা—

৺ উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী।

তাঁহার লিখিত ডায়েরী।

১৮৭২। ফাল্গুন, শনিবার।

মুঙ্গের প্রাতঃভ্রমণ—ঈশ্বরের জগতে পর্ব্বত, নদী, বৃক্ষশ্রেণীতে কি সুন্দর ছবি অঙ্কিত। এমন স্থান আছে যেখানে গেলে মন আপনা হইতে ঈশ্বরে ধাবমান হয়। সূর্য্যের কিরণে তাঁর জ্যোতি, সমীরণে তাঁর প্রেমপ্রবাহ, পক্ষীর কুজনে তাঁর মধুরতা অনুভূতি হয়—কত সুখ, কত শান্তি। সুখের রাজ্যে বাস করিয়া আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাদিগকে দুঃখী করিয়া রাখি।

নির্জ্জন সাধন মনের অনেক দিনের বাসনা আর পূর্ণ হয় না, কত অবস্থা আসিয়া তাহার প্রতিকূল হয়। সুযোগ পাইলে ভুলিও না। আমরা কেন ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক ঈশ্বরের প্রতীক্ষা করি না। আজ ৫ মিনিট চেষ্টা করিলাম, হইল না, কালি হইল না—এইরূপে বৃথা চেষ্টা হয়। ঈশ্বর বলেন কৈ না হইলে ত আমার সন্তানের চলে, সেও অধিকক্ষণ ধরিয়া চেষ্টা করে না। প্রতীক্ষার মধ্যে ঈশ্বর দর্শনের সঙ্কেত।

১৩ই ফাল্গুন রবিবার।

ভাগলপুর নগরসঙ্কীর্ত্তন Not as to be expected as nothing was prepared. How the wide universe appeared dwelling house, where the sun and sky glorified God and we joined with them. The very thought is sublime.

Sermon যাহা আমার পক্ষে অসম্ভব, ঈশ্বরের পক্ষে সম্ভব, এই দৃঢ় বিশ্বাস চাই।

আলোচনা—বুদ্ধিগত মতকে বিশ্বাসে পরিণত করিতে হইলে সেই মত পরিষ্কাররূপে বুঝা এবং হৃদয়ের ভাব সেইরূপ হইবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা। অকৃতজ্ঞ পুত্র সেই প্রণালীতে কৃতজ্ঞ হয়।

আপনার দিকের সকল বিষয় সম্পূর্ণ থাকিলেও পবিত্র হইতে পারি না—ঈশ্বরের সম্পূর্ণরূপে আপনাকে ছাড়িয়া যত

তাহাতে বিশ্বাস হইবে তত উপকার হইবে। তত উপকার পাওয়া যাইবে। Self abnegation লুথারের মত।

রাত্রি—এই সংসার ছাড়া এমন একটী রাজ্য আছে তথায় আধ্যাত্মিক সমুদায় ব্যাপার স্পষ্ট লাভ হয়—যেমন সংসারিক ব্যাপার এখানে। কল্পনার কথা নয়। অনেকে সে রাজ্যে গিয়াছেন, আমরাও সময় সময় গিয়া থাকি। সেই রাজ্যে বাস করিতে না পারিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন নিরর্থক।

১লা মাঘ—১২৮০

ধর্ম্মপরিবার না হইলে চিরকাল আত্মা কোথায় থাকিবে? ঈশ্বরের চরণতলে মস্তক রাখিয়া সকলের সহিত এই পরিবার বন্ধন করিব।

১৩ই চৈত্র ১২৮০

বিভিন্ন ইচ্ছা সকল বিলুপ্ত করিয়া এক ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সকলে সংযুক্ত হও, প্রেম পরিবার হইবে।

বিজয় বাবু—ধর্ম্ম প্রচার করা জীবন্ত সর্প লইয়া খেলা করা।

—

ভূমিতে যত ফোঁটা বৃষ্টির জল পড়ে, তাহা বিফল হয় না, দৃশ্য বা অদৃশ্য ভাবেই হউক, ভূমির উর্ব্বরতার সহায়তা করে।

শূন্য ছোট ও বড় সকলেরই সমান মূল্য।

—

ইচ্ছা—অর্থ কেবল ইচ্ছা নয়, কিন্তু তজ্জন্য জীবনের ব্যাকুলতা। যদি তাহা না হয় আপনার সাধু ইচ্ছা বলিয়া প্রতারিত হইও না। মনের গতি যদি কুদিকে থাকে, হাজার ভাল ইচ্ছা থাকিলেও আমি পাপে মগ্ন আছি তাহার সন্দেহ নাই।

একটী বিশেষ সঙ্কল্প করিয়া না লাগিলে উদাসীন ভাবে কোন ফল লাভ হয় না।

২৬-৩৮০

(১) অসুরকে সামান্য বলিয়া কিছুমাত্র প্রশ্রয় দিলে ভয়ানক হইয়া প্রাণ বধ করে। ভয়নিক অসুরও উপবাস ও হোম যজ্ঞ দ্বারা নিশ্চয় দমন ও বিনষ্ট হয়। Keep with youlfelf at all time the secret of subduing the monsters. They well know their slaves, never leave them but they fear the God-fearing men.

2 Good resolutions carry out immediately without carring any consequence what ever any obstacle in the way is your veteran enemy, let it be a bad habit,

৩০-১০-৮৫। (পচৱা)

তুমি প্রাণ জুড়ান ধন, হৃদয় পরশমণি
অমূল্য রতন
প্রাণান্তে তোমায় যেন ভুলিনা কখন।
রাখব তোমায় হৃদয় ঘরে, যতনে আদর
করে,
প্রেম ভক্তি উপহারে করিব পূজন।
তোমা ধনে হয়ে ধনী; (সুখদুঃখ তুচ্ছ গণি)
আনন্দে দিবা রজনী,
(তব সহবাস সুখে) করিব যাপন।

পেয়েছি সুধার স্বাদ নামেতে তোমার,
ভুলিতে কি পারি ও নাম, ওকি ভুলিবার।
নাম নয় ভর সুধা, পিতে পিতে বাড়ে ক্ষুধা
ভকত পরাণ সদা নামে মাতোয়ারা,
প্রেম পুণ্য শান্তি নদী, বহে নামে নিরবধি,
পরশনে মৃত প্রাণে জীবন সঞ্চার।
ঐ নাম সুধা পান করি, মৃত্যুঞ্জয় ত্রিপুরারি,
পার হল ভববারি কত পাপী দুরাচার।
অতি যতনেরই ধন,
প্রাণের প্রাণ তুমি, প্রাণ রমণ।
হৃদয় রতন তুমি পরশ রতন।
সুধাময় করুণা নিধি, আনন্দ প্রেম জলধি,
সর্ব্ব-সন্তাপ-হরণ, সুখ প্রস্রবণ।

৫ই অক্টোবর ১৮-৬—মঙ্গলবার।

পঢেশায় আসিবার জন্য যাত্রা করিয়া পথে চুঁচুড়ায় মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করা যায়। তাঁহার দেহে মৃত্যুর ছায়া লক্ষিত হইল, কিন্তু প্রাণ ঈশ্বরে সমর্পিত, পরলোকের সুখাস্বাদন করিতেছে। আহার গিয়াছে, ইন্দ্রিয় সকল বিকল, বিষয়ের সহিত যোগ বিচ্ছিন্ন প্রায়, কিন্তু আশ্চর্য্য তাঁহার স্মরণ শক্তি, আশ্চর্য্য তাঁহার স্নেহ ভালবাসা, সর্ব্বোপরি আশ্চর্য্য তাঁহার ব্রহ্মানুরাগ ও ব্রহ্মানন্দোচ্ছ্বাস। কয়েক দিন পূর্ব্বে তিনি কয়েকটি বন্ধুকে এই শ্লোক দ্বারা তাঁহার জীবনের বর্ত্তমান চিন্তা, ভাব ও কার্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন :—

অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং
চন্দ্র ইব রাহোর্ম্মুখাৎ প্রমুচ্য
ধূত্বা শরীরং অকৃতং কৃতাত্মা,
ব্রহ্মলোকমভি সম্ভবামীত্যভিসম্ভবামীতি।

ধর্ম্ম বিষয়ের আলাপে তিনি ক্লান্ত নন্ এবং মধ্যে মধ্যে যুবার ন্যায় উৎসাহ প্রকাশ করেন। তিনি তাঁহার জীবনে বিশ্বাস ও ধর্ম্মের জয় কিরূপ হইয়াছে গল্প করিতে বড় আনন্দিত। ব্যাখ্যান এখন তাঁহার নিজের পক্ষে Lesson হইয়াছে বলেন। যখন ব্যাখ্যানের জ্বলন্ত উপদেশ সকল দেন, তখন তাঁহার মুখ হইতে সেগুলি কিরূপে বহির্গত হইত, বুঝিতে পারিতেন না। রবিবার আহারের পর সমাজের বেদীর নীচে বসিয়া ঈশ্বর চিন্তা করিতে করিতে কত কি মনে আসিত। সন্ধ্যার সময় উঠিয়া স্নান করিয়া আসিয়া বেদীতে বসিতেন। যাহা বলিবেন একটু ভাবিয়া লইতেন। পূর্ব্ব সপ্তাহের ব্যাখ্যান পাঠে একটা সুর ধরিতে পারিতেন। পরে মুখ হইতে অনর্গল যাহা বলিবার বাহির হইয়া যাইত। এই সময় তাঁহার বৈষয়িক অবস্থা এরূপ যে সমুদায় খোয়াইবার সম্ভাবনা। তিনি সে দিকে অল্প দৃষ্টি করিতেন দিবানিশি ধর্ম্ম বিষয় লইয়া থাকিতেন। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার কোন বিষয়ে কিছু ক্ষতি হয় নাই।

বিদ্যুৎপুরুষ ঈশ্বর ক্রমে সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশবান হইবেন ব্যাখ্যা করিলেন। ঈশ্বরের অনিমেষ দৃষ্টি অনুভব সাধনের এক উৎকৃষ্ট উপায় বলিলেন। Attentive চিত্তের একাগ্রতার প্রধান সাধন বলিলেন।

অলকা।

গল্প।

১

তখন সবে মাত্র ভোর হইয়াছে—দুই একটি দোয়েল পাখী সঙ্কীর্ণ নদীর পাড়ের বাঁশ গাছের ঝোপের মধ্যে বসিয়া আধ ঘুমঘোরে, আধ অন্ধকারে, আলস্য-বিজড়িত স্বরে, কেবল মাত্র সীস্ দিতে আরম্ভ করিয়াছে—উষার বাতাস সংসার হইতে নিদ্রাদেবীকে সরাইয়া দিবার জন্য কেবল মাত্র মৃদু মৃদু বহিতে আরম্ভ করিয়াছে—এমন সময় বাহিরে দরজায় হঠাৎ যেন কাহার করাঘাতে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলাম। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। মনে মনে ভাবিলাম—হয়ত ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিয়াছি। মনের মধ্যে কিছুক্ষণ এই কথা তোলাপাড়া করিলাম—কিন্তু কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। অন্যমনস্ক হইয়া বাহিরের ঘরে একটা আরাম-কেদেরায় বসিয়া পড়িলাম। তখন বেশ ফরসা হইয়া গিয়াছে।—ভৃত্য আসিয়া, "চার পেয়ালা" দিয়া ডাকঘরে ডাক আনিতে চলিয়া গেল। আমি বসিয়া বসিয়া সেই কথাই ভাবিতে লাগিলাম। যখন চমক ভাঙ্গিল দেখিলাম আমার কেদারার পাশে একখানি ক্ষুদ্র টেবিলের উপর কয়েক খানি পত্র রহিয়াছে। ভৃত্য কখন ফিরিয়া আসিয়া চিঠি গুলি রাখিয়া গিয়াছে কিছুই জানিতে পারি নাই, আমি সেগুলি লইয়া একখানি একখানি করিয়া সমস্তগুলি পাঠ করিলাম। তাহার মধ্যে একখানি পত্র আমার জনৈক বন্ধু লিখিয়াছিলেন। তিনি পশ্চিমে গভর্ণমেণ্টের কার্য্য করিতেন। পত্রখানিতে লেখা ছিল যে, আমাকে কোনও বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে সেই দিনই তাঁহার কাছে যাইতে হইবে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া, স্নানাহার সমাপন করিয়া আমি বর্দ্ধমান হইতে বেলা দশটার গাড়ীতে রওনা হইলাম। চারি দিকে প্রকৃতির শোভা দেখিতে দেখিতে, কত দেশের পর দেশ, গ্রামের পর গ্রাম পার হইয়া সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে আমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম। আমার বন্ধু ষ্টেশনে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, আমি গাড়ী হইতে নামিয়া তাঁহার সহিত গল্প করিতে করিতে তাঁহাদের বাসায় উপস্থিত হইলাম, এবং এ কথা সে কথায় গত রাত্রের কথা একেবারেই ভুলিয়া গেলাম।

আমার বাটী কুসুমপুর। রেল ষ্টেশন হইতে চারি মাইল দূরে অবস্থিত। কুসুমপুর একটি গণ্ডগ্রাম—শুনিতে পাওয়া যায় পূর্ব্বে এখানে অনেক দস্যুর বাসস্থান ছিল। কিন্তু এখন আর সে সমস্ত ভয়

নাই। কালে কালে সকলই অন্তর্হিত হইয়াছে।

আমাদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নয়। চাকরী বাকরী না করিলেও মোটামুটি এক রকম চলিয়া যাইতেছিল। আমি নিজে কিছু কিছু লেখা পড়াও জানিতাম। আমাদের আদি নিবাস বর্দ্ধমানে—সেখানে একটু আধটু বিষয় সম্পত্তিও ছিল। কিন্তু সেখানে আমাদের সরিকানি বিবাদের জন্ম বিরক্ত হইয়া আমার পিতা সমস্ত বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া এই কুসুমপুর গ্রামে চলিয়া আসেন। তখন আমি খুব ছেলে মানুষ। আমাদের কুসুমপুরে ২।৩ বৎসর বাসের পর আমার পিতার মৃত্যু হয়। তখন আমার বয়স ৮ বৎসর। সেও আজ প্রায় ১৫।১৬ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। শৈশবে পিতৃহীন হইয়া কিছুদিন পড়া শুনা করিয়া আমি লেখা পড়া ছাড়িয়া দিলাম—সেই অবধি বাটীতেই থাকি। সংসারে কেবল আমি এবং আমার জননী। আমি আজও বিবাহ করি নাই,—মনে সঙ্কল্প আছে, বিবাহ করিবও না।

কুসুমপুরে আমার শয়নকক্ষে একটী আলমারীতে কয়েকখানি পুস্তক ছিল, কখনও তাহা পাঠ করিয়া এবং কখনও দু'একজন প্রতিবেশীর বাটীতে যাইয়া গল্পগুজবে আমার দিনগুলি বেশ কাটিয়া যাইত। কখন কখনও দু'একটী অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে দূর দেশে যাইয়া দু'এক মাস কাল কাটাইয়া আসিতাম।

কুসুমপুরে আমাদের এক ঘর প্রতি-বেশী ছিলেন—তাঁহার নাম হরিচরণ মুখোপাধ্যায়। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। আমি অধিকাংশ সময় তাঁহার নিকটে বসিয়া অনেক গল্প শুনিতাম। হরিচরণ বাবু অপুত্রক ছিলেন। সংসারে তাহার স্নেহের বন্ধন এক ভাগিনেয়ী ছিল। তিনি তাহাকে কখনও কাছ ছাড়া করিতেন না। শুনিয়াছি তাঁহার ভগিনীপতি চন্দ্রমাধব চট্টোপাধ্যায় চিরকালই দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। ভবিষ্যতের ভাবনা তাঁহার ছিল না বলিলেই হয়। তাঁহার বৃহৎ জমীদারীর কোথায় কি হইতেছে তাহার কোনই তত্ত্বাবধান করিতেন না। কেহ তাঁহাকে সংসারে তাঁহার উক্তবিধ ঔদাসীন্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন "ভগবান্ যাহার অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই হইবে—আমরা অনর্থক পরস্পরে মনোমালিন্য সৃষ্টি করি কেন?" তাঁহার এইরূপ বিষয়কার্য্যে বীতরাগ দেখিয়া কর্ম্মচারিগণ আপনাপন স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত যথেচ্ছরূপ কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। তাহার শেষ ফল এই হইয়াছিল যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গেল। হরিচরণ বাবু এই সংবাদ শ্রবণে তাঁহার ভগিনী ও তদীয় কন্যাকে স্বীয় বাটীতে আনয়ন করেন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই তাঁহার ভগিনীরও কালপ্রাপ্তি হয়। সুতরাং বালিকা শৈশব হইতেই হরিচরণ বাবু ও তদীয় স্ত্রীর আদর ও যত্নে বর্দ্ধিত হইয়া

ছিল। আমি কুসুমপুরে থাকিতে যখনই হরিচরণ বাবুর বাসায় যাইতাম—বালিকা ছুটীয়া বাহিরের ঘরে আসিত। তখন তাহার কোনও সঙ্কোচ বা কোনও সরম বন্ধন ছিল না। হরিচরণ বাবু যখন গল্প করিতেন—বালিকা আমার মুখের দিকে বিলোলনয়নে চাহিয়া দেখিত। তাহার সেই সকল চাহনীতে আমার তখন যেন কেমন লজ্জা বোধ হইত, আমি অন্য দিকে চক্ষু ফিরাইতাম। কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারে আমার নয়নদৃষ্টি পুনরায় সেই সরলতার প্রতিমূর্ত্তি সঙ্কোচহীনা বালিকার প্রতি যে কখন ধীরে ধীরে আসিয়া পতিত হইত, বুঝিতে পারিতাম না। কিন্তু যাক্ সে কথা।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে আমার প্রবাস-কার্য্য সমাধা করিয়া আমি যখন বাটী আসিয়া পৌঁছিলাম তখন রাত্রি প্রায় ১১টা। পল্লীগ্রামের প্রায় সকলেই তখন শান্তিময়ী নিদ্রার কোলে শায়িত। রজনী জ্যোৎস্নাময়ী। আকাশে দুই একখানি সাদা সাদা মেঘ মাঝে মাঝে ভাসিয়া যাইতেছিল, কোন কোনও বাড়ীর বহি-প্রাঙ্গনায় বাঁধা সাদা কাল দুই চারিটী গাভী নিদ্রার ঘোরে রোমন্থন করিতেছিল এবং তাহাদের আশে পাশে দলবদ্ধ মশকের ঐক্যতান বাদন রজনীর নিস্তব্ধতার সঙ্গে সঙ্গে বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। আমি বাটী পৌঁছিয়া দুই একবার ডাকাডাকি করিবার পরেই আমার ভৃত্য চক্ষু মুছিতে মুছিতে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া জননীর কক্ষ-দ্বারে আসিয়া তাঁহাকে ডাকিলাম এবং তাঁহার সহিত প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া শয়ন করিতে গেলাম। জননী খাবার কথা জিজ্ঞাসা করায় বলিলাম আমি খাইয়া আসিয়াছি এবং আমার শয়ন কক্ষের দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িলাম। পথশ্রান্তিতে বিশেষ ক্লান্তি বোধ হওয়াতে অল্পক্ষণের মধ্যেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল, দেখিলাম তখন একটু বেলা হইয়াছে—চারিদিকে রৌদ্রের কিরণ পড়িয়া আমার কক্ষটী বেশ আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে। আমি বাহিরে যাইলাম এবং প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া খবরের কাগজপাঠে মনঃসংযোগ করিলাম। কিন্তু কেন জানি না মন যেন কেমন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। আমি পাঠ বন্ধ করিয়া হরিচরণ বাবুর বাটীর উদ্দেশে বহির্গত হইলাম। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখি, তাঁহার সদর দরজায় তালা বন্ধ। আমার আপনা আপনিই একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইল—যেন কিরূপ এক শূন্যতা অনুভব করিতে লাগিলাম—যেন কিসের অভাব বোধ হইতে লাগিল—যেন কি ছিল—এখন নাই! যেন কি আশা করিয়াছিলাম—তাহা মিটাইতে পারিলাম না।

বাড়ী আসিয়া জননীর মুখে শুনিলাম, আমি যে দিন পশ্চিমে যাই, সেই দিন

রাত্রিতে হরিচরণ বাবু সপরিবারে তীর্থ ভ্রমণে চলিয়া গিয়াছেন।

এইরূপ ভাবে কিছুদিন গেল। আমি পরিবর্ত্তনশীল কালের সঙ্গে সঙ্গে নবীনস্রে গা ঢালিয়া দিয়া সমস্ত পুরাতন স্মৃতি ও অতীত ঘটনা একে একে বিস্মৃত হইলাম। হঠাৎ এক দিন আমার মনে হইল আবার যেন কে আমার দুয়ারে আসিয়া আঘাত করিল। তখন ঠিক মধ্য রাত্রি। আমি কেবলমাত্র বাতি নিবাইয়া শুইয়া পড়িয়াছি। তখনও ঘুমাই নাই। আস্তে আস্তে চোরের ন্যায় উঠিয়া খুব আস্তে আস্তে দরজার নিকটে যাইলাম। মনে হইল যেন কে বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমি খিল খুলিয়া ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখি কে একটী অবগুণ্ঠনবতী রমণী আমার ঘরের পাশে দাঁড়াইয়া আছে। আমি কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম "কে?" কিন্তু কোনও উত্তর পাইলাম না। আমার কথা যে তাহার কাণে পৌঁছিয়াছে এমনও বোধ হইল না। আমি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কে"? অবগুণ্ঠনবতী হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া অবগুণ্ঠন আরও একটু টানিয়া দিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেলেন। আমি অনেকক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। কি যে ভাবিয়াছিলাম তাহা ঠিক স্মরণ নাই—কেবল এইমাত্র মনে আছে যে, একটি অবগুণ্ঠিতা রমণী লজ্জায় জড়সড় হইয়া নিস্তব্ধতার কোলে যেন কোথায় মিলাইয়া গেল। এই ঘটনার পর কতদিন চলিয়া গিয়াছে। প্রত্যহই সন্ধ্যা হইলে আমার প্রাণের মাঝে কেমন যেন একটা আকুলি বিকুলি করিয়া উঠে—কেমন যেন একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস আপনা আপনিই বাহির হইয়া পড়ে—কেমন যেন সন্ধ্যার উদার বাতাসের সহিত একটা অনন্ত ভাবনা আপনি আপনিই আসিয়া পড়ে কিছুই বুঝিতে পারি না। যেন কি একটা অব্যক্ত কৌতূহলে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ি।

এইরূপে আরও কিছুদিন গেল। আমি কাহাকেও কিছু বলিলাম না।—কিন্তু অনেকেই আমার এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং দুই একজন আমাকে প্রশ্নও করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি সে প্রশ্ন হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম।

ছেলেবেলা হইতেই বিদেশ ভ্রমণের প্রলোভনটা আমার পক্ষে অপরিহার্য্য ছিল। কিন্তু সকল-সময় সুযোগ হইয়া উঠিত না কারণ, জননী গৃহে একা থাকিতে পারিতেন না। আমার বোধ হয় জননীর আপত্তি করিবার আরও বিশেষ একটু কারণ ছিল—সে কারণ তিনি মুখে কিছু না বলিলেও আমি বুঝিতে পারিতাম—সেটী আমার কৌমার্য্য। পাছে, আমি সন্ন্যাসী হইয়া যাই, পাছে দেশ-পর্য্যটনের ছুতা করিয়া আর গৃহে ফিরিয়া না আসি, এই ভয়ে বিদেশে যাইতে চাহিলেই তাঁহার স্নেহ-বিগলিত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস অশ্রুকণাতে

পরিণত হইয়া কঠিন শৃঙ্খলের স্থায় আমাকে বেষ্টন করিয়া ধরিত—আমার আর যাওয়া হইত না। কিন্তু মনটা বিশেষ খারাপ হওয়াতে আমি অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া এবার তাঁহার অনুমতি আদায় করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। আমি আমার গন্তব্য স্থান হরিদ্বার ঠিক করিয়া পরদিন পাঞ্জাব মেলে রওনা হইলাম। একাকী যাইব মনস্থ করিয়াছিলাম কিন্তু জননীর একান্ত ইচ্ছায় পুনরায় ভৃত্য নীলমণিকে সঙ্গে লইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। হরিদ্বারে একটী বাঙ্‌লো গোছের ছোট বাসা ভাড়া লইয়া কয়েক দিন সেখানে নিভৃত জীবন অতিবাহিত করিলাম। তখন শরতের প্রারম্ভ। প্রাবৃটের বর্ষণশীল জলধারা নাই বলিলেই হয়। আমি প্রাতে উঠিয়া বাঙ্গালোর বারাণ্ডায় একখানি আরাম-কেদারায় বসিয়া বসিয়া দেখিতাম দূরে পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে কেমন মেঘগুলি সাজিয়া থাকিত! দূরে দূরে কেমন তাহারা ভাসিয়া যাইত! পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ দিয়া রজতসূত্রের স্থায় ক্ষীণকায়া নির্ঝরিণী রৌদ্রের আলোয় কেমন চিক্‌চিক্ করিয়া জলিয়া উঠিত! নীলাকাশের নীচে পাখীরা কলরব করিতে করিতে কোন্ সুদূরে উড়িয়া যাইত, দূরে জাহ্নবীর তীরে বেদ পাঠ করিতে করিতে কত সন্ন্যাসী প্রোজ্জল সূর্য্যকে কতবার নমস্কার করিত —তাহাদের সুমধুর কণ্ঠ-নিঃসৃত বেদগান ক্ষীণতর হইতে ক্ষীণতম হইয়া কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া প্রাণের মধ্যে কি এক আবেশ জাগাইয়া দিত। মনে হইত সেই সুদূর অতীতের আর্য্য ঋষিদের কথা, মনে করিয়া কতবার ভক্তিপ্রণত-চিত্তে উদ্দেশে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতাম। অপরাহ্ণে প্রায়ই গঙ্গার ধারে পর্ব্বতের উপরে, অনেক দূর অবধি বেড়াইয়া আসিতাম।

সেদিন শুক্লপক্ষের সপ্তমী। আমি দৈনন্দিন্ অভ্যাসানুযায়ী বেড়াইতে বেড়াইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছিলাম। যখন ফিরিয়া আসি তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। পশ্চিমাকাশে ভাঙ্গা চাঁদখানি পাহাড়ের উপর হাসিতেছিল—দূরে সান্ধ্য বাতাস পাগলের মত এ পাহাড় হইতে ও পাহাড়ে যেন কাহাকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিল। বনের ভিতর হইতে কত রকম ফুলের গন্ধ মাঝে মাঝে ভাসিয়া উঠিতেছিল। মাথার উপর কত নিশাচর পাখী কত রকম ডাক্ ডাকিয়া উড়িয়া যাইতেছিল। আমি অনেক দূর তখন চলিয়া আসিয়াছি—একটা পাহাড়ের উপর হইতে নামিয়া আসিয়া যেমন সমতল ভূমিতে পদার্পণ করিব—এমন সময় সম্মুখে যেন কোনও মনুষ্যের মূর্ত্তি দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম—পরক্ষণেই চক্ষু মেলিয়া আর কিছু দেখিতে পাইলাম না। ও কিছু নয়—ভাবিয়া দুই এক পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই আবার পূর্ব্ববৎ বোধ হইল: তখন পাশে যেখানে পর্ব্বত হইতে ঝরণা বাহির হইয়া খানিকটা সমতল ভূমিতে হঠাৎ হ্রদের মত স্থির হইয়া

আছে সেই দিকে ভাল করিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম—অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে যেন মনে হইল তাহারই তীরে কে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে। আমি সেই দিকে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গেলাম। গিয়া দেখিলাম একটী রমণী—যুবতী নীরব নিশ্চল ভাবে দণ্ডায়মান। আমি অনেকক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়াইয়া রহিলাম। যেন বোধ হইতে লাগিল রমণীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি আমার মুখের প্রতি স্থাপিত—সে দৃষ্টি ব্যাকুলতাময়—যেন কি চায় স্থির করিতে পারিলাম না। উভয়েই অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। তখন ক্ষীণ চন্দ্র পর্ব্বতের পার্শ্বে ঢলিয়া পড়িয়াছে। বাতাস গুলি ছুটীয়া আসিয়া ক্ষুদ্র হ্রদের ঢেউগুলিকে সপ্রেম আলিঙ্গনে জড়াইয়া ধরিয়া পায়ের বালুকার উপর কেমন ধীরে ধীরে শায়িত করিতেছিল—জলের মধ্যে পাথরগুলি এক একবার মাথা তুলিয়া তাহাদের খেলা দেখিয়া পুনরায় ঢেউগুলির মধ্যে কোথায় ডুবিয়া যাইতেছিল—পর্ব্বতের শৃঙ্গ শৃঙ্গে চাঁদের আলোয় গাছের পাতাগুলি কেমন চক্‌মক্ করিতে ছিল—পর্ব্বতের নীচের অন্ধকার ক্রমশ ঘনীভূত হইয়া সমস্ত প্রকৃতিকে যেন স্তব্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। আমি আর একবার রমণীর মুখের প্রতি চাহিলাম—মরি মরি—এত সৌন্দর্য্য বুঝি আর কখনও দেখি নাই। সে কি দেখিলাম কেমন করিয়া বুঝাইব। সেই করুণ দৃষ্টিতে যে কি কারুণ্য মাখান ছিল কেমন করিয়া বুঝাইব—সেই কালো কালো তারাবিশিষ্ট চক্ষু, সেই কুঞ্চিত অলকদাম—সেই যুগ্ম ভ্রূযুগল—সেই কারুণ্যমাখা মুখখানি—সেই নির্জ্জন বনমধ্যে যে কি সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাই বা কেমন করিয়া বুঝাইব? আমি কি এক প্রকার মোহাভিভূত হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম। ধীরে ধীরে যেন কি মনে পড়িতে লাগিল—যেন কি এক অতীত স্মৃতি হৃদয়ে আসিয়া আঘাত করিতে লাগিল। আমার ক্ষীণকণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল—"অলি"—রমণী হাসিলেন। সে কি হাসি? ফুল ঝরিয়া যাইবার আগে যে হাসি হাসে, প্রদীপ নিভিবার আগে যেমন হাসে—চাঁদ ডুবিবার সময় যেমন হাসে এও বুঝি সেই হাসি। পৃথিবীতে সব ভুলিব সে হাসি কখন ভুলিব না—সেই মুহূর্ত্তে যদি মরিতাম—সেই মুহূর্ত্তে যদি বাতুলতা প্রাপ্ত হইতাম তাহা হইলে হয়ত ভুলিতে পারিতাম।

আমার সব মনে পড়িয়া গেল। সহস্র অতীত স্মৃতি একসঙ্গে হৃদয়ে সমুপস্থিত হইয়া আমাকে একেবারে অভিভূত করিয়া তুলিল। আমি কেমন এক ব্যাকুল প্রাণে রমণীর দিকে অগ্রসর হইলাম—সে মূর্ত্তি সরিয়া গেল—আমি যন্ত্রণা পীড়িত হৃদয়ে ডাকিলাম—"অলকা!" কোনও উত্তর পাইলাম না। রমণী পুনরায় হাসিলেন সেই ক্ষীণ হাসি!—আমি আরও অগ্রসর হইলাম—সে মূর্ত্তি যেন

চকিতের মধ্যে বনমাঝে কোথায় মিলাইয়া গেল। তখন চাঁদ ডুবিয়া গিয়াছে—অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে—উন্মাদ পবন হু হু করিয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম—আর কিছু দেখিতে পাইলাম না। আকুলকণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিলাম "অলি! —অলকা!"

সেই নিস্তব্ধ নিশীথে পাহাড়ের কন্দরে কন্দরে কেবল প্রতিধ্বনি উত্তর করিল—"অলি! অলকা!" আর কিছু শুনিতে পাইলাম না। আমি সেইদিন বাসায় ফিরিয়া অলকার অনুসন্ধান করিয়াছিলাম—শুনিলাম কিছুদিন পূর্ব্বে হঠাৎ বিষম জ্বরে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। অলকা হরি চরণ বাবুর ভাগিনেয়ী।

শ্রীক্ষীরোদগোপাল রায়।

রহস্য।

সংসার যখন তা'রে কোলাহল মাঝে
আকুল আহ্বানে ডেকে—আপনার কাজে
রাখে তারে ভুলাইয়া, যেন আবরণে
লুকাইয়া রাখে আহা! হৃদয়ে—গোপনে,—
তুমি তারে ডেকে লও ইঙ্গিতে তোমার
রাতুল চরণ-প্রান্তে;—শুধু এ'সংসার—
জেগে রয় বুকে লয়ে পবিত্র নির্ম্মল
মুক্ত-প্রাণ হাসি তা'র—আর অশ্রু জল!

তারপর—তারপর অতি ধীরে ধীরে
সংসার ঢালিয়া দেয় অনন্ত সাগরে
প্রাণের সকল ভার,—মিশে যায় সব!
আবার সেথায় উঠে নব কলরব!
এমনি মায়ার খেলা! তবু এ'সংসার—
বোঝেনা—যে যায়—সেত ফিরে নাক আর!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

বারাণসী তত্ত্ব।

প্রথম অধ্যায়।

হিন্দুদিগের সপ্ততীর্থ-মধ্যে কাশীই প্রধান। যথা:—

কাশী কাঞ্চী চ মায়াখ্যা ত্বযোধ্যা দ্বারবত্যপি।
মথুরাবন্তিকা চৈতাঃ সপ্ত পুর্য্যোঽত্র মোক্ষদাঃ

কাশী, কাঞ্চী (কাঞ্চী), মায়া, অযোধ্যা, দ্বারাবতী, মথুরা, অবন্তিকা—এই সাত তীর্থ মোক্ষদা বলিয়া খ্যাত।

মায়া এখন হরিদ্বারকে বলে। উক্ত সপ্ত তীর্থের মধ্যে কাশীর নামই সর্ব্ব প্রথমে রক্ষিত হইয়াছে কারণ কাশীই সকলের প্রধান বলিয়া গণ্য। কাশী

অতি পুরাতন নগর, মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে কাশীর নাম উল্লেখ আছে যথাঃ—

ত্রিদিবং স গতো রাজা যযাতির্নহুষাত্মজঃ ॥
পুরুশ্চক্ষার তদ্রাজ্যং ধর্ম্মেণ মহতাবৃতঃ।
প্রতিষ্ঠানে পুরবরে কাশিরাজো মহাযশাঃ ॥

পৃথিবীতে যে সকল পুরাতন নগরের কথা আমরা অদ্যাবধি শুনিয়াছি তন্মধ্যে কাশীই যে সকলের অপেক্ষা পুরাতন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ব্যাবিলন যখন নিনেভার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত, টাইরি যখন স্বীয় উপনিবেশের রাজ্য প্রশস্ততর করিতেছিল, এথেন্সের যখন অভ্যুদয়ের প্রারম্ভ, রোমের বাহুবল যখন পৃথ্বীতলে প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছিল তাহার বহু পূর্ব্বেই ভারতবর্ষে কাশী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সলোমনের নাম যখন দিগন্তবিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তখন তাঁহার রাজধানী সুশোভিত করিবার জন্য কাশী হইতে হাতির দাঁতের জিনিষ সকল রপ্তানি হইত। কাশী বহুকাল হইতেই পূজিত হইয়া অদ্যপিও সঞ্জীবিত আছে। পৃথিবীতে কত কত রাজা, কত কত অভ্যুত্থান ও পতন হইয়া গিয়াছে, কাশী কিন্তু ভারতবর্ষে সমানভাবে পূজিত হইয়া আসিতেছে। প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র যাত্রী কাশীতে আগমন করে। কাশীর নাম হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ। ভারতের সকল স্থান হইতেই বৃদ্ধগণ কাশীতে মরণ লালসায় আগমণ করে। কাশীর সত্র নিচয় বিদ্যার্থীর জন্য প্রতিষ্ঠিত। বিধবাগণ মন্দিরে টাকা জমা দিয়া সারাজীবন আপনাদিগের আহারের বন্দোবস্ত করিতে পারে। এই সকল কারণের জন্য দূর দেশ হইতে লোকে কাশীতে আগমন করে। কাশী হিন্দু ধর্ম্মের মহীয়সী শক্তির জাজ্বল্যমান প্রমাণ, বৌদ্ধ ধর্ম্মের মহা শ্মশান এবং ষড় দর্শনের লীলা ক্ষেত্র। এইখানেই মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ধর্ম্মার্থে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া হীনবৃত্ত চণ্ডালের চাকরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই খানেই ভগবান শঙ্করাচার্য্য স্বীয় অদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। এই খানেই শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ শাস্ত্রীয় তর্কে পরাজিত হন। কালের কঠোর আঘাতে হিন্দুদিগের সবই গিয়াছে, বাকী আছে কেবল মাত্র ধর্ম্ম, তাহাও কিন্তু এখন ঘোর তমসাচ্ছন্ন।

কাশীর সেবা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। প্রবাদ আছে :—

রাঁড়, সাঁড়, সিঁড়ি, সন্ন্যাসী।
ইনসে বাঁচে সেবে কাশী।

অর্থাৎ বিধবা, সাঁড়, সিঁড়ি এবং সন্ন্যাসী হইতে যাঁহারা বাঁচেন তাঁহারাই কাশীর সেবা করিতে পারেন নতুবা নহে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাঁড় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—দেখিলেই ভয়ের উদ্রেক হয়। তখন লোকে ভাবে আর কাশী সেবার আবশ্যকতা নাই, প্রাণ বাঁচিলে অনেক ধর্ম্ম হইবে। পক্কবিম্বাধরা বিধবাগণের সংখ্যা কম নহে সুতরাং রসিক চূড়ামণিদিগের অভাব নাই। সিঁড়ি চড়িতে চড়িতে

লোকে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহাও দেবদর্শনের একটি বাধক। সন্ন্যাসীদিগের জন্য লোককে জ্বালাতন হইতে হয়। এ সকল বাধা সত্ত্বেও তীর্থস্থান মাত্রই পুণ্য-জনক বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কাশীখণ্ডে লেখা আছে :—

প্রভাবাদদ্ভুতাদ্ ভূমেঃ সলিলস্য চ তেজসা।
পরিগ্রহান্মুনীনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যতা স্মৃতা॥

ভূমির অদ্ভুত প্রভাবহেতু, সলিলের তেজ-জন্য এবং মুনিগণের পরিগ্রহ-হেতু, তীর্থসমূহ পুণ্যজনক বলিয়া গণ্য।

এই জন্যই তীর্থে পাপিগণের সমাগম অধিক হয়। তাহাদিগের ধারণা যে, তীর্থ-গমনে সর্ব্বপাপের নাশ হইয়া থাকে। সুতরাং এমন সুযোগ তাহারা ছাড়িবে কেন? তাহারা জানে না যে শাস্ত্রের আদেশ অন্যরূপ ; যথা :—

যো লুব্ধঃ পিশুনঃ ক্রূরো দাম্ভিকো বিষয়াত্মকঃ।
সর্ব্বতীর্থেষ্বপি স্নাতঃ পাপমলিন এব সঃ॥
অশ্রদ্দধানঃ পাপাত্মা নাস্তিকোঽচ্ছিন্নসংশয়ঃ।
হেতুনিষ্ঠশ্চ পঞ্চৈতে ন তীর্থফলভাগিনঃ॥
(কাশীখণ্ড)

অর্থাৎ যে লোভী, নিন্দক, ক্রূর, দাম্ভিক, বিষয়াসক্ত, সে যদি সর্ব্বতীর্থে স্নান করে তাহা হইলেও সে পাপ মলিন থাকিবে।

শ্রদ্ধাহীন, পাপাত্মা, নাস্তিক, সন্দিগ্ধ, ও হেতুনিষ্ঠ এই পাঁচ শ্রেণীর ব্যক্তি তীর্থ-ফলভোগী হয় না।

মহানির্ব্বাণতন্ত্র আরও বলেন :—

ত্যক্ত্বা স্বাধ্যয়নং পিত্রোঃ শুশ্রূষাং দাররক্ষণম্।
নরকায় ভবেত্তীর্থং তীর্থায় ব্রজতাং নৃণাম্॥

অর্থাৎ অধ্যয়ন, পিতামাতার শুশ্রূষা এবং দাররক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া তীর্থে গমন করিলে তীর্থ নরকের হেতু হইয়া থাকে।

সমস্ত সহরটা বেনারস বা কাশী নামে খ্যাত। কিন্তু কেহ কেহ সহরটীকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন। যথা, বেনারস, কাশী এবং কেদার। বর্ত্তমান সহরের উত্তরাংশের নাম বেনারস, দক্ষিণাংশের নাম কাশী এবং কাশীর দক্ষিণ কেদার নামে খ্যাত। শেষোক্তটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

পুলিস এবং মিউনিসিপাল কার্য্যের জন্য বেনারস সাত ভাগে বিভক্ত, যথা ভেলুপুরা, দশাশ্বমেধ, চৌক, চেতগঞ্জ, কোতয়ালী, জাইতপুরা এবং আদমপুরা। ইহাতে সিকরোল এবং ক্যাণ্টনমেণ্ট যোগ করিলে, একুনে নয়টী বিভাগ হয়। এক একটীর বৃত্তান্ত আমরা পৃথক পৃথক বলিব। পরন্তু বর্ণনাসৌকর্য্যার্থে নদী-সম্মুখস্থ স্থানগুলি হইতে আরম্ভ করিতে বাধ্য হইলাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নদীসম্মুখস্থ ভেলুপুরা।

সহরের দক্ষিণপ্রান্তে অসিনালা অব-স্থিত। যে স্থানে গঙ্গা আসিয়া মিলিত হইয়াছেন সেই স্থান হইতে ঘাট ও মন্দিররাজির প্রারম্ভ বলিতে হইবে।

ঘাটে শত শত নরনারী স্নান করিতেছে। নিরীহ ব্রাহ্মণগণ স্নানান্তে ঘাটে উপবেশন করিয়া পূজায় তৎপর রহিয়াছেন। মহিলাগণ জলে অবগাহন করিয়া স্বীয় স্বীয় ইষ্টদেবতার স্মরণ করিতেছেন আর রমণী লাবণ্য দর্শন-লোলুপ ব্যক্তিগণ অনিমেষ নয়নে যুবতীদিগের প্রতি চাহিয়া আছেন। টিকটিকি যেমন মক্ষিকা-প্রত্যাশে বসিয়া থাকে পাণ্ডাগণও স্নাতকদিগের জন্য অনুরূপ প্রতীক্ষা করিতেছে। ঘাটে যাইবামাত্রই ঘাটমাহাত্ম্য শুনিতে পাওয়া যায়। স্নাতকগণও সেই ধ্বনি শুনিয়া স্বীয় গন্তব্য ঘাটে যাইয়া স্নান করিয়া থাকে। ইহাতে পাণ্ডাগণেরও কথঞ্চিত ধনাগম হয়। স্নানের জন্য প্রসিদ্ধ ঘাটপঞ্চকের মধ্যে অসিঘাট একটি। প্রবাদ এইরূপ যে, দুর্গাদেবী শুম্ভ নিশুম্ভ অসুরদ্বয়কে পরাভূত করিয়া দুর্গাকুণ্ডে আগমন করতঃ বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এই সময়ে আপনার অসি ফেলিয়া দিলে তথায় এক নালা প্রস্তুত হইয়া যায়, তাহাই এখন অসিনালা নামে খ্যাত। যাহারা এই নালাটি পার হইয়া কাশীতে গমন করে, দেবীর কৃপায় তাহারা বিগত-কল্মষ হয়। নিকটেই জগন্নাথ দেবের মন্দির। এখানে তিনটী মূর্ত্তি বিরাজমান—দক্ষিণে জগন্নাথ, বামে বলদেব এবং মধ্যে সুভদ্রা। প্রথম মূর্ত্তিটীর হাতের উপরার্দ্ধ আছে নিম্নার্দ্ধ নাই। ইঁহার পদদ্বয়ের অস্তিত্ব আমরা দেখিতে পাইলাম না। শেষোক্ত মূর্ত্তিটী হস্তপদ বিহীন। মূর্ত্তির একটা পারিপাট্য হওয়া আবশ্যক, কিন্তু আমরা তাহা কিছু দেখিলাম না। সুতরাং ইহা হিন্দুশিল্প কিনা তাহাতে আমাদিগের সন্দেহ রহিল। যে হিন্দুজাতির সভ্যতা বহু পুরাতন, যাহাদিগের শিল্প আজিও পাশ্চাত্য জগতের অনুসন্ধানের বিষয়, তাহারা যে এবম্ভূত কদর্য্য শিল্প রাখিবে ইহা আমার কল্পনায়ও আইসে না। সত্য বটে হিন্দুর ধর্ম্মজীবনে বাহ্যিক পারিপাট্য লক্ষ্যের বিষয় নহে—আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যই তাহার মুখ্য লক্ষ্য, তথাপি যখন মূর্ত্তিই রাখিতে হইয়াছে তখন একটা ভাল মূর্ত্তিই রাখা উচিত ছিল। জগন্নাথদেব হিন্দুর নমস্য। সুতরাং আমরাও ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিলাম। আষাঢ় মাসে রথযাত্রার সময় যখন জগন্নাথদেব রথারূঢ় হন তখন একটা বড় মেলা হইয়া থাকে। স্নানযাত্রার দিন জগন্নাথদেবকে স্নান করাইয়া সন্ধ্যাকালে ভক্তদিগকে দেখান হয়। এই সময়ে অসিঘাট হইতে জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি লইয়া আসিয়া রথে রাখা হয়। উড়িষ্যাতে জগন্নাথদেবের যেরূপ মেলা হয় তাহার অনুকরণেই এই মেলা হইয়া থাকে। মেলাটি তিন দিন থাকে। তৃতীয় দিনের মেলায় প্রায় ৫০ হাজার লোকের সমাগম হইয়া থাকে। ভাদ্রমাসেও এই স্থানটিতে আর একটী মেলা হয়, পরন্তু তাহা তত বড় নহে। এই মেলাটি অসি-সঙ্গম অথবা লোহারিকুণ্ডের সান্নিধ্যে হইয়া থাকে। কুণ্ডটীতে দুইটী কূপ

আছে। ইন্দোরের সুপ্রসিদ্ধা রাণী অহল্যা বাই, বিহারের রাজা এবং অমৃত রাও এই কূপের খননকর্ত্তা। মেলার দিন হিন্দুগণ সূর্য্যপূজার জন্য এই কুণ্ডে স্নান করেন। কূপের তিন দিকে সিঁড়ি আছে। নিম্নে অবতরণ করিতে হইলে উক্ত সিড়ির আশ্রয় লইতে হয়। সিঁড়ির উপর সূর্য্যদেবের মূর্ত্তিস্বরূপ একটী চক্র আছে। রবিবারে লোকে ইহার পূজা করিয়া থাকে। জগন্নাথদেবের নিকট কতকগুলি আখাড়া আছে, যাহার মধ্যে বড়া গুদড়জীর আখাড়াটীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। আখাড়াটী প্রায় সার্দ্ধ তিন শত বৎসর ব্যাপিয়া স্বীয় অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে। ইহাতে প্রায় ত্রিশ জন বৈষ্ণব বৈরাগী বাস করেন। আখাড়ার প্রতিষ্ঠাতার নাম গুদড়জী। বলা বাহুল্য, ইনিও একজন বৈষ্ণব ছিলেন। ছোটা গুদড়জীও বৈষ্ণব বৈরাগীদিগের সম্পত্তি পরন্তু ইহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে ইহার অস্তিত্ব চলিয়া আসিতেছে এবং লোকের অনুকম্পায় আখড়াটীর সরবরাহ চলিতে থাকে। দিগম্বরী আখড়াটিতে দশ বৈরাগী ব্যক্তির বাস। ইহারা ভিক্ষোপজীবী। নগ্ন হইয়া থাকে বলিয়া ইহারা দিগম্বরী নামে খ্যাত। আখড়াটিও আধুনিক। বৈদ্য আখড়ার প্রতিষ্ঠাতার নাম স্বামী রামদাসজী নন্দ। ইনও বৈষ্ণব ছিলেন। প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে এই আখড়াটি তৈয়ার হয়। চুনারের সন্নিকটস্থ খজুরীপুর নামক স্থানে এই আখাড়াটীর কিছু সম্পত্তি আছে। অসি সঙ্গমের নিকট ব্রাহ্মণদিগের "পণ্ডিতজী" আখাড়া অবস্থিত। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে টীকাদাস নামক জনৈক ব্যক্তি এই আখাড়াটী নির্ম্মাণ করেন। এই স্থানের শিষ্যগণকে ঐহিক এবং পারত্রিক সম্বন্ধীয় শিক্ষা দেওয়া হয়। বিহারান্তর্গত আরা এবং দ্বারভাঙ্গা নামক স্থানের জমিদারী হইতে এই আখড়াটির সরবরাহ চলিয়া থাকে। অসমহল্লার কৃষ্ণ আচারী নামক এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ দ্বারা কৃষ্ণ আচারী আখাড়া প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনি ১৮৬৫ খৃঃ কাশীধামে আগমন করিয়া ব্রাহ্মণদিগের জন্য একটী বিদ্যালয় এবং মন্দির স্থাপন করেন। আখাড়াটীতে শিষ্যসংখ্যা প্রায় ২০ জন। আখাড়াটীর সরবরাহের জন্য ইংরাজসরকারের নিকট প্রায় আট হাজার টাকা গচ্ছিত রাখা হইয়াছে। তাহার সুদ হইতে এবং বেতিয়ার রাজার মাসিক ৫০ টাকা চাঁদা হইতে আখাড়াটীর সকল খরচ চলিয়া থাকে। কাশীতে বিষ্ণুপন্থি আখড়াটিই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রসিদ্ধ সংস্কারক রামানুজ ইহার প্রতিষ্ঠাতা। এই স্থানের শিষ্যগণ সকলেই ভিক্ষোপজীবী। দাদুপন্থি আখাড়া বুদ্ধন নামক জনৈক ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ইনি অপুত্রক ছিলেন। এক দিন নদীসৈকতে একটী শিশুকে অসহায় অবস্থায় পতিত দেখিয়া তাহাকে বাটী লইয়া আসিয়া তাহাকে পালন করেন। এই শিশুর নাম দাদু। সাড়ে তিন শত বৎসর

পূর্ব্বে দাদু সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া দাদু পন্থী নামক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন অসিঘাটের নীচেই তুলসী ঘাট। মহাত্মা তুলসীদাস বারানসীক্ষেত্রে বহুকাল নিবাস করিয়া ১৬২৩ খৃঃ দেহত্যাগ করেন। বঙ্গদেশের জয়দেব যেমন কৃষ্ণ-ভক্ত ছিলেন, মহাত্মা তুলসীদাসও তেমন রামভক্ত ছিলেন। ইহাঁর মনোমুগ্ধকারী সরল কবিতা যিনি একবার পড়িয়াছেন, তিনি জীবনে ইহার নাম কখনও বিস্মৃত হইবেন না। হিন্দি ভাষা যতদিন সজীবিত থাকিবে ততদিন তুলসী দাসের নাম লুপ্ত হইবে না। মহাত্মা তুলসী দাসের অনেকগুলি স্মৃতিচিহ্ন মন্দিরে রক্ষিত রহিয়াছে। তিনি যে হনুমান মূর্ত্তির পূজা করিতেন এবং যে তরণী করিয়া নদীর পরপারে যাইতেন তাহার কিয়দংশ এখনও আমাদিগের নয়ন পথের পথিক হয়। হনুমান ঘাটে নাগাদিগের "জুনি" আখাড়া আছে। এলাহাবাদ, হরিদ্বার উজ্জয়িনী এবং গোদাবরীতে উক্ত আখাড়াটীর শাখা দৃষ্ট হইয়া থাকে। নাগাগণ ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানেই পরিভ্রমণ করে। রাজপুতানার রাজগণ এবং ভারতের অন্যান্য রাজন্যবর্গ ইহাদিগের পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং তাহারা অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ। হনুমান ঘাটে প্রবাদ আছে যে রামদাস নামক জনৈক দ্যূতক্রীড়কের এক রাত্রির জুয়ার টাকা দ্বারা ঘাটটি নির্ম্মিত হইয়াছে। ঘাটের উপরিস্থিত একটী প্রকোষ্ঠে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গুরু বল্লভাচার্য্য বাস করিতেন। ১৬২০ খৃঃ শাস্ত্র ব্যাখ্যা কালে ইনি পদস্খলিত হইয়া নদীতে পড়িয়া যান ও তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। হনুমান ঘাটের পরেই রায় বলদেব সাহা এবং বাচ্ছ রাজ ঘাট। এই ঘাটের বড় বিশেষ প্রসিদ্ধি নাই। অতঃপর একটী প্রসিদ্ধ শিবালয় আছে। পূজার জন্য বহু লোক এখানে আসিয়া থাকে। এখানে যে একটী দুর্গ দেখা যায়, তাহার নির্ম্মাতার নাম বৈজনাথ মিশ্র। এই খানেই রাজা চেত সিংহ বাস করিতেন। ১৭৮১ খৃঃ বিদ্রোহী হওয়ার অপরাধের জন্য তাঁহার বসত বাটীটি বেদখল করিয়া দিল্লীর সম্রাটগণের বংশধরগণকে দেওয়া হয়। কিছু দূরেই শিবালয় ঘাট। এখানে দুইটি আখাড়া আছে;—একটীর নাম নির্ব্বাণী এবং অপরটির নাম নিরঞ্জনী প্রথমটী ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে নগ্ন নাগাগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, যাহাদিগের একটী শাখা এলাহাবাদে দৃষ্ট হইয়া থাকে। দ্বিতীয়টিও নাগাদিগের সম্পত্তি, পরন্তু ইহাদিগের প্রধান আড্ডা বরোদায়। ইহারা নিরংকার অর্থাৎ অমূর্ত্ত দেবতার উপাসক। শিবালয় ঘাটের পরই লীলা ঘাট আর কেদার ঘাট। বাঙ্গালীদিগের কেদারেশ্বরের মন্দির হইতে এই ঘাট ক্রমশঃ নিম্নে চলিয়া গিয়াছে। বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনের মধ্যে কেদারেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। ইহার চারি কোণে আরও চারিটী মন্দির আছে। মধ্যে বারাণ্ডায় ভিতর অনেক দেবতারই মূর্ত্তি দেখা যায়।

বাঙ্গালীগণ কেদারেশ্বরের বিশেষ ভক্ত সুতরাং মন্দিরে ভীড় লাগিয়াই থাকে। পূর্ব্বদিকের দরজা দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। এখান হইতে একটি প্রশস্ত রাস্তা নদী পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। দরজার দুই পার্শ্বে কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত দুইটী মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিদ্বয় দেখিতে অতীব সুন্দর। ইহাদিগের প্রত্যেকটীর চারি হস্ত। এক হস্তে ত্রিশূল, দ্বিতীয়টীতে গদা, তৃতীয়টিতে পুষ্প এবং চতুর্থট খালি। এই খালি হাতটি আঙ্গুল নির্দ্দেশ করিয়া যেন আগন্তুকগণকে কহিতেছেন "তোমরা এইখানে অবস্থান কর, দেবাদেশ প্রাপ্ত হইলে ভিতরে যাইও"। যখন কতকগুলি ব্যক্তি মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে তখন দরজা বন্ধ হইয়া যায়। তাহাদিগের পূজা সাঙ্গ হইলে দ্বার পুনরায় উদ্ঘাটিত হয় এবং তখনই বহিঃস্থিত ব্যক্তিগণ ভিতরে প্রবেশ করিতে পান।

উক্ত মূর্ত্তির মধ্যস্থিত স্থান দিয়া মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিতে হয়। দ্বারদেশে সপ্তবর্ত্তী দীপ দিবার বন্দোবস্ত আছে। সায়ংকাল সমাগত হইলে এই সকল দীপরাজি প্রজ্বলিত করা হয়। মন্দিরের ভিতর কেদারেশ্বরের বিগ্রহ বিরাজিত। কেদারেশ্বর মহাদেবের নামান্তর মাত্র। কেদার কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে। হিমালয়ে কেদার নামে একটী স্থান আছে। মহাদেব সেইখানে বাস করেন। এতদ্ধেতু তিনি কেদার নামে খ্যাত। কিন্তু বেনারসে প্রবাদ এই যে, কেদার নামে এক ভক্ত ব্রাহ্মণ ছিল। বশিষ্ঠ ঋষির সহিত তিনি হিমালয়ে যান এবং তথায় তিনি এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন। মরিবার সময় মহাদেব তাঁহাকে দেবত্ব অর্পণ করেন। তদবধি তিনি মহাদেবের সহিত পূজা পাইয়া আসিতেছেন। মহাদেব বশিষ্ঠ ঋষির উপাসনায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলেন, "তুমি বর প্রার্থনা কর, আমি তোমার উপাসনায় সন্তুষ্ট হইয়াছি।" তখন বশিষ্ঠ মুনি এই প্রার্থনা করেন যে, আপনি বারাণসী ধামে আগমন করিয়া বাস করুন। মহাদেব তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিত হন। তদবধি তিনি বেনারসে আসিয়া বাস করিতেছেন। এই বৃত্তান্তটি কাশীখণ্ডে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনন্ত তুষার মণ্ডিত হিমালয়ে হরিনাথ নামে এক বিখ্যাত মন্দির আছে তাহার সন্নিকটে, কেদারেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। এখানেও অনেক তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়।

কেদারেশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেবমূর্ত্তিও আছে, যথা—লক্ষ্মীনারায়ণ, ভৈরবনাথ, গনেশ এবং অন্নপূর্ণা। যে দ্বার দিয়া ঘাটে যাওয়া যায় তাহার উপর বাঙ্গালা এবং হিন্দি ভাষায় কেদারেশ্বরের মহিমা লেখা আছে। মন্দিরের বহির্ভাগে ভিখারীগণ বসিয়া থাকে। লোক দেখিবামাত্র তাহারা ভিক্ষার জন্য কেহ বা হস্ত প্রসারণ করিয়া দিতেছে এবং কেহ বা শত ছিন্ন বসন পাতিয়া দিতেছে। তাহাদিগকে দেখিলেই পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়।

কেদারেশ্বরের ঘাটের নীচেই গৌরী-কুণ্ড নামে একটি কূপ আছে। প্রবাদ এইরূপ যে, সেই কূপোদকে জ্বর আরোগ্য হয়। কেদারেশ্বরের নীচে চৌকী ঘাট। এখানে একটী অশ্বত্থ বৃক্ষ পথিকগণকে প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডতাপ হইতে রক্ষা করিতেছে। ১৫ই আষাঢ় এখানে "বাতাস পরীক্ষা" নামে একটি মেলা হয়। এইদিনে হিন্দু-গণ স্বীয় স্বীয় গুরুর পূজা করিয়া থাকেন। এতদ্ধেতু ইহা গুরু-পূর্ণিমা নামে খ্যাত। পুরাকালে জ্যোতিস্বিদ্‌গণ সায়ংকালে এই স্থানে সমাগত হইয়া বায়ুপ্রবাহ নির্ণয় করতঃ জলদাগম ও শস্য সম্বন্ধে ভবিষ্য-দ্বাণী বলিতেন। চৌকা ঘাটে বিজয়া দশমীর দিন রামলীলার মেলা হইয়া থাকে। এই দিনে লঙ্কেশ্বর রাবণ, রাম-চন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। সেই অতীত কাহিনীর স্মৃতি সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য হিন্দুগন রামলীলা করিয়া থাকেন। এই মেলায় অনূন ত্রিশ সহস্র লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এই দিনে শমী বৃক্ষের পূজা হইয়া থাকে। যদি এই সময়ে নীলকণ্ঠ পক্ষীর দর্শন পাওয়া যায় তবে হিন্দুগণ শুভ লক্ষণ বলিয়া মানিয়া থাকেন।

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম মঙ্গল অথবা শনিবারে চৌকা ঘাটে বরুণা পিয়াল মেলা হইয়া থাকে। নীচ জাতীয় ব্যক্তি-গণ এই মেলাতে মদ্য, মাংস এবং সরবত দ্বারা কালকা এবং সাহজীর পূজা করিয়া থাকে। কালকা ব্রাহ্মণী এবং সাহজী চর্ম্মকার রমণী ছিল। পূজা সমাধা হইলে ব্যক্তিগণ শিবপুরে যাইয়া অতিশয় মদ্য পান করে এবং পরদিনে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগত হয়।

১৫ই অগ্রহায়ণ চৌক ঘাটে নগর প্রদ-ক্ষিণের মেলা হইয়া থাকে। দুই দিনে সমগ্র নগরটা প্রদক্ষিণ করিতে হয়। প্রথম দিনের প্রদক্ষিণকার্য্য চৌকা ঘাট হইতেই আরম্ভ হইয়া থাকে।

চৌকা ঘাট হইতে কিছু অগ্রসর হই-য়াই রুক্ষেশ্বর দেবের মন্দির বিরাজমান। ইহার নিকট অন্যান্য মন্দিরও আছে। অতঃপর নারদ ঘাট। দেবর্ষি নারদের নামে এই ঘাটটীর নামকরণ হইয়াছে। ইহার পরেই ভেলুপুরার উত্তর সীমা।

শ্রীমতী হেমন্ত কুমারী দেবী।

শিখগ্রন্থ—সুখমণি সাহিব।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

বিরথী শাকত কি আরজা।
সাচ বিনা কহ হোবত সুচা।
বিরথা নাম বিনা তন অন্ধ।
মুখ আবত তাকৈ দুর্গন্ধ।

বিন সিমরণ জিন রৈন বৃথা বিহার।

মেঘ বিনা যিউ খেতী যায়।

গোবিন্দ ভজন বিন বৃথে সভ কাম।

যিউ কিরপন কে নিরস্নাথ দাম।

ধংন ধংন তে জন যিহ ঘট বসিও হরি নাউ।

নানক তাকৈ বলি বলি যাউ॥৬

শাক্তদিগের জীবন বৃথা।

সত্যাঁবিনা কেমন করিয়া পবিত্র হইবে?

নাম বিনা তনু বৃথা এবং অন্ধ ;—

এমন ব্যক্তির মুখ হইতে দুর্গন্ধ আসে।

হরিস্মরণ বিনা রাত্রি এবং দিন বৃথা কাটায় ;—

যেমন জল বিনা খেত নষ্ট হয়।

গোবিন্দ ভজন বিনা সকল কার্য্যই বৃথা ;—

যেমন কৃপণের ধন বৃথা পড়িয়া থাকে।

সেই ব্যক্তিই ধন্য ধন্য যাহার হৃদয়ে হরিনাম বাস করে।

নানক এমন ব্যক্তিকে বলিহারি যান॥৬

রহত অবর কিছু অবর কমাবত।

মন নহী প্রীত মুখহ গংড লাবত।

জানন হার প্রভু পর বীন।

বাহর ভেখন কাহু ভীন।

অবর উপদেশৈ আপ ন করৈ।

আবত যাবত জনমৈ মরৈ।

জিসকৈ অন্তর বসৈ নিরঙ্কারা।

তিসকী সীখ তরৈ সংসারা।

যো তুম ভানে তিনে প্রভ জাতা।

নানক উন জন চরন পরাতা॥৭

কত রয়েছে তবুও মনে আরও বাসনা।

মুখে ভগবত প্রীতি দেখায় কিন্তু মনে নাই।

কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ প্রভু সকল জানেন।

বাহিরে ভালবাসার ভান কিন্তু ভিতরে ভিন্ন।

অপরকে উপদেশ দেয় কিন্তু আপনি তাহা করে না।

সে কেবল আসে ও যায়, জন্মে ও মরে।

কিন্তু যার অন্তঃকরণে নিরঙ্কার বাস করেন ;

তার শিক্ষাতে সংসার তরে যায়।

যাহাদিগকে প্রভু তুমি ভাল বাস, তাহারাই প্রভুকে জানে ;

নানক এমন ভক্তের চরণে পতিত হন্॥৭

করউ বেনতী পারব্রহ্ম সভ জানৈ।

অপনা কীয়া আপহি মানৈ।

আপহি আপ করত নিবেরা।

কিসৈ দুর জনারত কিসৈ বুঝারত নেরা।

উপাব সিয়াপন সগল তে রহত।

সভ কছু জানৈ আতম কী রহত।

জিস ভাবৈ তিস লয়ে লড় লায়।

থান থনন্তর রহিয়া সমায়।

সো সেবক জিস কিরপা করী।

নিমখ নিমখ জপ নানক হরি॥৮

ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর, তিনি সব জানেন।

তিনি আপনার কার্য্য আপনি করিতেছেন।

তিনি আপনিই সকল ব্যবস্থা করিতেছেন।

কাহাকেও তিনি বুঝান যে তিনি দূরে আছেন, কাহাকেও জানান নিকটে আছেন।

তিনি সকল প্রকার ধূর্ত্ততা ও ফিকিরে রহিত

তিনি আত্মার গতি সব জানেন।

যাহাকে তিনি কৃপা করেন তাহাকে নিজের অঞ্চলে টানিয়া লন।

সকল স্থানে তিনি ব্যাপ্ত রহিয়াছেন

যাহাকে তিনি কৃপা করেন সেই তাঁহার সেবক হইতে পারে।

নানক বলিতেছেন, সেই ব্যক্তি প্রতি নিমেষে হরি নাম জপ করে।

শ্লোক ৬।

কাম ক্রোধ অরু লোভ মোহ বিনশ যায় অহমেব।

নানক প্রভ শরণাগতী কর প্রসাদ গুরুদেব॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এবং অহঙ্কার নষ্ট হইয়া যায়।

নানক বলিতেছেন যে প্রভুর শরণ লইয়াছে, গুরুদেব তাহাকে দয়া করেন॥

অষ্টপদী।

যিহ প্রসাদ ছতিহ অংমৃত খাহি।
তিস ঠাকুর কউ রখ মন মাহি।
যিহ প্রসাদ সুগংধর তন লাবহি।
তিসুকউ সিমরত পরম গতি পাবহি।
যিহ প্রসাদ বসহি সুখ মন্দর।
তিসহি ধিয়ায় সদা মন অন্দর।
যিহ প্রসাদ গৃহ সংগ সুখ বসনা।
আট প্রহর সিমরহু তিস রসনা।
যিহ প্রসাদ রংগ রস ভোগ।
নানক সদা ধ্যাই ধ্যাবন যোগ॥১

যাঁহার প্রসাদে ছত্রিশ প্রকার অন্ন খাইতেছ, সেই ঠাকুরকে মনোমধ্যে রাখ।

যাঁহার প্রসাদে সুগন্ধি বস্ত্র ভোগ করিতেছ, তাঁহাকে স্মরণ করিলে পরম গতি প্রাপ্ত হইবে।

যাঁহার প্রসাদে সুখের ভবনে বাস করিতেছ,

তাঁহাকে সর্ব্বদা মনোমধ্যে ধ্যান কর।

যাঁহার প্রসাদে সকলের সঙ্গে সুখে গৃহে বাস করিতেছ,

তাঁহাকে অষ্ট প্রহর রসনায় স্মরণ কর।

যাঁহার প্রসাদে রঙ্গ রস ভোগ করিতেছ,

নানক বলিতেছেন, তাঁহাকে সর্ব্বদা ধ্যান কর, তিনি ধ্যানের যোগ্য॥১

যিহ প্রসাদে পাট পটংবর হঢাবহি।
তিসহি ত্যাগি কত অবর লুভাবহি।
যিহ প্রসাদে সুখ শেজ শোইজৈ।
মন আট প্রহর তাকা যশ গাবিজৈ।
যিহ প্রসাদ তুঝ সভ কোউ মানৈ।
মুখ তাকো যশ রসন বখানৈ।
যিহ প্রসাদি তেরো রহতা ধর্ম্ম।
মন সদা ধ্যায় কেবল পার ব্রহ্ম।
প্রভজী জপত দরগহ মান পাবহি।
নানক পতি সেতী ঘর যাবহি॥২

যাঁহার প্রসাদে রেসমের বস্ত্র পরিধান করিতেছ।

তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য কত বিষয়ে তুমি লোভ করিবে?

যাঁহার প্রসাদে সুখ শয্যায় শয়ন কর,

হে মন অষ্টপ্রহর তাঁহারই যশ গাও।

যাঁহার প্রসাদে তোমাকে সকলে সম্মান করিতেছে,

তোমার মুখ যেন সর্ব্বদা তাঁহারই যশো-
গান করে।
যাঁহার প্রসাদে তুমি ধর্ম্মপথে আছ,
হে মন সর্ব্বদা সেই পরব্রহ্মেরই ধ্যান কর।
প্রভুর নাম জপ করিয়া তুমি তাঁহার দ্বারে
সম্মান পাইবে,
নানক বলিতেছেন, সম্মানের সহিত তুমি
তাঁহার ঘরে যাইবে ॥২

যিহ প্রসাদ অরোগ কংচন দেহী।
লিব লাবহু তিস রাম সনেহী।
যিহ প্রসাদ তেরা ওলা রহত।
মন্ সুখ পাবহি হরি হরি যশ কহত।
যিহ প্রসাদ তেরে সগল ছিদ্র ঢাকে।
মন সরনী পর ঠাকুর প্রভ তাকৈ।
যিস প্রসাদ তুঝ কো ন পহুচে।
মন শাসি শাসি সিমরহু প্রভ উচে।
যিহ প্রসাদ পাই দুর্লভ দেহ।
নানক তাকীভ গতি করেহ ॥৩

যাঁহার প্রসাদে অরোগী এবং কাঞ্চনবর্ণ
দেহ পাইয়াছ,
হে বন্ধু, সেই রামের প্রতি অন্তঃকরণকে
সম্পূর্ণরূপে লাগাও।
যাঁহার প্রসাদে তোমার উপর সর্ব্বদা
আবরণ রহিয়াছে,
হে মন, সেই হরির যশ গান কর, সুখ
পাইবে।
যাঁহার প্রসাদে তোমার সকল দোষ
ঢাকিয়া যায়,
হে মন, সেই ঠাকুর সেই প্রভুকে স্মরণ কর।
যাঁহার প্রসাদে তোমার তুল্য কেহ হইতে
পারে না,
হে মন সেই উচ্চ প্রভুকে প্রতিশ্বাসে স্মরণ
কর।
যাঁহার প্রসাদে দুর্লভ দেহ পাইয়াছ,
নানক বলিতেছেন, তাঁহাকে ভক্তি কর ॥৩

যিহ প্রসাদ আভূষণ পহিরিজৈ।
মন তিস সিমরত কিউ আলস কিজৈ।
যিহ প্রসাদ অশ্ব হস্ত অসবারী।
মন তিস প্রভকউ কবহু ন বিসারী।
যিহ প্রসাদ বাগ মিলখ ধনা।
রাখ পরোয় প্রভু অপনে মনা।
যিন তেরী মন বনত বনাই।
উঠত বৈঠত সদ তিসহি ধিয়াই।
তিসহি ধিয়ায় যো এক অলখৈ।
ইহা উহা নানক তেরী রখৈ ॥৪

যাঁহার প্রসাদে তুমি ভূষণ পরিধান কর,
হে মন, তাঁহাকে স্মরণ করিতে আলস্য
কেন?
যাঁহার প্রসাদে তুমি অশ্ব হস্তী যান অর্থাৎ
সওয়ারিরূপে পাইয়াছ
হে মন, সেই প্রভুকে কখনও ভুলিও না।
যাঁহার প্রসাদে তুমি উদ্যান, বিষয় এবং
ধন পাইয়াছ,
সেই প্রভুকে তুমি তোমার অন্তঃকরণে
গাঁথিয়া রাখ।
হে মন, যিনি তোমাকে সাজাইতেছেন,
তুমি উঠিতে বসিতে সর্ব্বদা তাঁহাকেই
স্মরণ করিবে।
তাঁহাকেই ধ্যান কর, যিনি এক এবং
অলক্ষ্য।
নানক বলিতেছেন তিনি ইহলোকে এবং
পরলোকে রক্ষা করেন ॥৪

যিহ প্রসাদি করহি পুংন বহু দান।
মান আটি প্রহর করি তিস্‌কা ধ্যান।
যিহ প্রসাদ তুঁ আচার ব্যোহারী।
তিস প্রভকউ খাসি খাসি চিতারী।
যিহ প্রসাদি তেরা সুন্দর রূপ।
সো প্রভু সিমরহু সদা অনূপ।
যিহ প্রসাদি তেরি নিকি জাতি।
সো প্রভু সিমরহু সদা দিন রাতি।
যিহ প্রসাদ তেরী পতি রহৈ।
গুরু প্রসাদি নানক যশ কহৈ ॥৫

যাঁহার প্রসাদে তুমি অনেক পুণ্য দান করিতেছ,
হে মন, অষ্ট প্রহর তাঁহারই ধ্যান কর।
যাঁহার প্রসাদে তুমি আচারী ও ব্যবহারী,
সেই প্রভুকে তুমি প্রতি শ্বাসে স্মরণ রাখিও।
যাঁহার প্রসাদে তুমি সুন্দর রূপ পাইয়াছ,
সেই অনুপম প্রভুকে সর্ব্বদা স্মরণ করিও।
যাঁহার প্রসাদে তুমি উত্তম জাতিতে জন্মিয়াছ,
সেই প্রভুকে রাত্রি দিন স্মরণ কর।
যাঁহার প্রসাদে তুমি সম্মানিত হও,
নানক বলিতেছেন, গুরুপ্রসাদে তাঁহার যশ কীর্ত্তন কর ॥৫

যিহ প্রসাদি শুনহি কর্ণ নাদ।
যিহ প্রসাদি পেখহি বিসমাদ।
যিহ প্রসাদি বোলহি অংমৃত রসনা।
যিহ প্রসাদি সুখ সহজে বসনা।
যিহ প্রসাদি হসত কর চলহি।
যিহ প্রসাদি সংপূরণ ফলহি।
যিহ প্রসাদি পরম গতি পাবহি।
যিহ প্রসাদ সুখ সহজ সমাবহি।
ঐসা প্রভু তিয়াগ অবর কত লাগহু।
গুরুপ্রসাদি নানক মন জাগহু ॥৬

যাঁহার প্রসাদে কর্ণ শুনিতে পায়,
যাঁহার প্রসাদে চক্ষু নানা বস্তু দেখে,
যাঁহার প্রসাদে রসনা মিষ্ট বাক্য বলে,
যাঁহার প্রসাদে তুমি সুখে ও শান্তিতে বাস কর,
যাঁহার প্রসাদে হস্ত কার্য্য করে,
যাঁহার প্রসাদে তুমি সম্পূর্ণ ফল লাভ কর,
যাঁহার প্রসাদে তুমি পরম গতি প্রাপ্ত হও,
যাঁহার প্রসাদে সুখে ও সহজে মন মগ্ন হয়,
এমন প্রভুকে ছাড়িয়া অপর কিসে আকৃষ্ট হইবে?
নানক বলিতেছেন, গুরুপ্রসাদে জাগরিত হও ॥৬

যিস প্রসাদি তুঁ প্রগট সংসার।
তিস প্রভকউ মুল ন মনহু বিসার।
যিহ প্রসাদি তেরা পরতাপ।
রে মন মূঢ় তু তাকউ জাপ।
যিহ প্রসাদি তেরে কারয পুরে।
তিসহি জান মন সদা হজুরে।
যিহ প্রসাদি তুঁ পাবহি সাচ।
রে মন মেরে তু তাসিউ রাচ।
যিহ প্রসাদি সভকী গতি হোয়।
নানক জাপ জপৈ জপি সোয় ॥৭

যাঁহার প্রসাদে তুমি সংসারে সম্মানিত,
সেই প্রভুকে কখনও মন হইতে ভুলিও না।

যাঁহার প্রসাদে তুমি প্রতাপবান্,
রে মূঢ় মন, তুমি তাঁহাকে জপ কর।
যাঁহার প্রসাদে তোমার কার্য্য পূর্ণ হয়,
হে মন, তাঁহাকে সর্ব্বদা সম্মুখে জানিও।
যাঁহার প্রসাদে তুমি সত্যকে লাভ কর,
হে আমার মন, তুমি তাঁহারই সঙ্গে প্রেম কর।
যাঁহার প্রসাদে সকলের গতি হয়,
নানক বলিতেছেন, যদি জপ কর ত তাঁহারই জপ কর ॥৭

আপি জাপয়ে জপৈ সো নাউ।
আপি গাবায়ে সু হরিগুণ গাউ।
প্রভ কিরপা তে হোয় প্রগাস।
প্রভু দয়াতে কমল বিগাস।
প্রভু সুপ্রসংন বসৈ মন সোয়।
প্রভু দয়াতে মতি উত্তম হোয়।
সরব নিধান প্রভ তেরী ময়া।
আপিহ কছু ন কিনহু লয়া।
জিত জিত লাবহু তিত তিত লগহি হরি নাথ।
নানক ইনকৈ কছু ন হাথ ॥৮

তিনি যাহাকে জপান সেই নাম জপ করিতে পারে।
তিনি যাহাকে গাওয়ান, সেই হরিগুণ গান করিতে পারে।
প্রভুর কৃপাতে হৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রকাশ হয়।
প্রভুর কৃপাতে হৃদয়-কমল প্রস্ফুটিত হয়।
প্রভু সুপ্রসন্ন হইয়া যাহার হৃদয়ে বাস করেন,
প্রভুর কৃপাতে তাহার সুমতি হয়।
হে প্রভু, সকল সম্পদ তোমারই মায়া,
কাহারও কিছু আপনার নাই।
হে হরি, হে নাথ, যাহাতে তুমি লাগাও তাহাতেই যেন মানুষ থাকে।
নানক বলিতেছেন, মানুষের কিছু হাত নাই ॥৮

ভুট্টা*।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ভুট্টার ফুল monoecious, যেহেতু ইহার পুং-অংশ (tassel) ও স্ত্রী-অংশ (ear) একই গাছে থাকে। এইরূপ আপনার আপনার মধ্যে রক্তের সম্বন্ধ লইয়া যে গর্ভ হয়, তাহাকে in-breeding বলে। আবার পুং-অংশের পুষ্পরেণু অন্য বা দূরবর্ত্তী গাছের স্ত্রী-অংশের সহিত মিলিত হইয়া যে গর্ভের সৃষ্টি হয়, তাহাকে cross-breeding বলা হয়। পাঠক পাঠিকা! এক্ষণে বোধ করি in-breeding ও cross-breeding-এর কি প্রভেদ তাহা বুঝিলেন।

* এ সম্বন্ধে আরও কিছু জানিবার ইচ্ছা থাকিলে ১৯১৪ ফেব্রুয়ারি মাসের মডার্ণ রিভিউতে "Hybridization Methods in Maize" নামে লেখকের প্রবন্ধ দেখুন।

ভালরূপ ভুট্টার ফসল পাইতে হইলে in-breeding বা cross-breeding এর আবশ্যক, তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাক। কোন কোন ফসলের, যেমন তামাক গাছের, উন্নতি করিতে হইলে, in-breeding এর আবশ্যক, কিন্তু ভুট্টার পক্ষে ইহা অনিষ্টকর। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, in-breeding বশতঃ (১) ভুট্টা গাছ হইতে কম ফসল পাওয়া যায়, (২) ভুট্টার এক একটি বিচির অঙ্কুরোদগম-শক্তি নিস্তেজ হয়, বীর্য্যের সে রকম তেজ থাকে না। (৩) বিচিগুলি দেরীতে পক্ক হয়; (৪) ভুট্টার আকারও ছোট হয় ও ওজনে ভারী হয় না। আমরা আমাদের দেশের ভুট্টা-ক cross-breeding এর দ্বারা কিরূপে আরও ভাল করিতে পারি তাহা এইবার বলিব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ভুট্টা অনেক জাতীয় আছে। মনে করা হউক যেন আমরা আমাদের বাগানে একজাতীয় ভুট্টার বিচি বপন করিব। cross-breeding করিতে হইলে লাইন করিয়া সারি সারি ভুট্টার বিচি লাগাইতে হইবে। শ্রেণীগুলির মধ্যে কিছু ব্যবধান থাকা চাই—যেমন নিম্নে দেখান হইয়াছে :—

D
১নং শ্রেণী ....
T
২নং " ________________
D
৩নং " ....
T
৪নং " ________________

"D" চিহ্নিত শ্রেণীর গাছগুলি বড় হইলে, তাহাদের পুং-অংশ (অর্থাৎ tassel) বাহির হইলে (পুষ্পরেণু পড়িবার পূর্ব্বেই) ঐ পুং-অংশ সমুদায় টানিয়া ভাঙ্গিতে হইবে, কিন্তু গাছের যেন কোন অনিষ্ট না হয়। ঐ কার্য্য ভালরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে শ্রেণীগুলি ধরিয়া তাহার মধ্য দিয়া দুই তিন দিন অন্তর যাওয়া আবশ্যক, কারণ সমস্ত গাছের tassel গুলি একই সময় বৃদ্ধি হয় না। এইরূপ শ্রেণীকে detasseled শ্রেণী বলা হয়। এইরূপে প্রত্যেক একান্তর শ্রেণীর পুং-অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। তাহা হইলে প্রথম শ্রেণীটা "detasseled" অর্থাৎ পুং-অংশ-কাটা, এবং তাহার পরটি অর্থাৎ "T" চিহ্নিত "tasseled শ্রেণী" অর্থাৎ পুং-অংশ-যুক্ত থাকিবে। এই "T" চিহ্নিত শ্রেণীর পুং অংশ হইতে পুষ্পরেণু ১ম শ্রেণীর গাছের স্ত্রী-অংশে (অর্থাৎ সিল্কে) পড়িয়া গর্ভ উৎপাদন করিবে, দ্বিতীয় শ্রেণীর গাছেতেও পড়িয়া থাকে। তাহা হইলে cross-breeding করা হইল। detasseled শ্রেণীর গাছের কিছু ভুট্টাকে বীজের জন্য রাখা উচিত, কারণ ঐগুলি দেখিতে ভাল, বড় ও বীর্য্য,-বান্।

আমেরিকার চাষারা বলেন, যিনি ভুট্টার চাষ করেন, তিনিত একজন ধনী লোক হইবেন, কারণ ভুট্টার পত্রসমূহ গৃহপালিত পশুদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য এবং ইহার দানা মানব ও পশুদের অতি পুষ্টিকর খাদ্য। কত বাণিজ্য-সংক্রান্ত দ্রব্যাদি যেমন চিনি,

সিরাপ, কর্ণ-ফ্লেক্স্ (যাহা ব্রেক্‌ফাষ্টের সময় খাওয়া হয়), ষ্টার্চ (যাহা রজকের বিশেষ কাজে লাগে), এল্‌কহল্, গ্লুকোজ, রং এর জন্য তৈল, রবার, কাগজ, খোসা গুলির দ্বারা গদি, জ্বালানি দ্রব্য প্রভৃতি হইয়া থাকে। বড়ই দুঃখের কথা যে, এইরূপ একটী মূল্যবান্ গাছের আদর আমাদের দেশের লোকে আমেরিকা-বাসীদের মত এখন পর্য্যন্ত করিতে শিখেন নাই।

শ্রীসত্যশরণ সিংহ।

মুষ্টিযোগ।

ঠুনকা বা স্তনে থুনকার উপায়।

শির্কা অল্প উত্তপ্ত করিয়া নেকড়া ভজাইয়া স্তনোপরি রাখিলে ঠুনকা আরোগ্য হয়।

গোল মরীচ, ঘৃতকুমারী, হলুদ পোড়া ছাই, একত্রে সমভাগে লইয়া ছাগলের দুধে বাটিয়া স্তনে প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়।

মুসুর ডালের প্রলেপেও উপকার হইতে পারে।

স্তনের বোঁটায় ক্ষত—

সোহাগার খৈ ও গাওয়া ঘি একত্রে মাড়িয়া স্তন-ক্ষতে প্রলেপ দিলে আরোগ্য হইবে।

"রূপটান"

অর্থাৎ স্ত্রীলোকের মুখশ্রী বৃদ্ধি করিবার উপায়—

১। "ঝুনা নারিকেলের জল"।

প্রত্যহ নারিকেলের জলে মুখ ধুইলে মুখের কালিমা, মেচেতা, ছুলি ও ব্রণ প্রভৃতি দূর হইয়া মুখের কান্তি বৃদ্ধি হয়। এমন কি ইহাতে বসন্তের দাগও মিলাইয়া যায়।

২। কাঁচা দুধে ময়দা গুলিয়া তাহাতে একটু কর্পূর দিয়া মুখে মাখিবে, পরে ধৌত করিয়া ফেলিবে। ইহাতে মুখের চর্ম্ম কোমল ও বর্ণ উজ্জ্বল হইবে।

লোমবিনাশক ঔষধ—

"বেরি সালফায়েড" ও "এরারুট"—এই দুইটী দ্রব্য এক ভাগ ও চারি ভাগে, অর্থাৎ এক ভাগ বেরি সালফায়েড ও চারি ভাগ এরারুট মিশ্রিত করিবে। পরে একটু জলে গুলিয়া লোমযুক্ত স্থানে মাখাইয়া দিবে। কিছুক্ষণ পরে ধৌত করিলে লোম সকল উঠিয়া যাইবে।

"হরিতাল" দ্বারাও অনেকে লোম উঠায়।

"সুগন্ধি নারিকেল তৈল"—

মাথার চুল ঘন ও চুলের শোভা বৃদ্ধি করিবার উপায়—

পরিষ্কার নারিকেল তৈল এক বোতল, মাথাঘসা তৈলের মশলা চূর্ণ (উৎকৃষ্ট

ও সুগন্ধযুক্ত মশলার আবশ্যক), চারি পয়সায় যাহা পাওয়া যায়, ক্যাষ্টারিস্ অয়েল—১০।১২ ফোঁটা।

একত্রে মিশাইয়া বোতল সমেত রৌদ্রে রাখিবে। পরে ব্যবহার করিবে। ইহাতে চুল ঘন ও কৃষ্ণবর্ণ হইবে। চুল উঠিবে না। অথচ চুল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। টাক পড়িবার সম্ভাবনা থাকিবে না স্ত্রী-লোকের চুলই অঙ্গের শোভা। অতএব যাহাতে স্ত্রীলোকের চুল না উঠিয়া বরং চুল ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। অনেকে আতর প্রভৃতি সুগন্ধযুক্ত তৈল ব্যবহার করেন। তাহাতে চুলের উপকার বৈ অপকার হয় না। আরও এই, তৈলে "মাথায় উকুন" হয় না।

বৃক্ষ।

শিক্ষা দিতে বৃক্ষ তুমি জন্মিয়াছ বিশ্বমাঝে,
হাস্তভরা অঙ্গখানি সুসজ্জিত পত্রসাজে।
মহাব্রতে ব্রতী তুমি সেবাব্রত ব্রতসার,
জীবনপণে জগজ্জনের সাধ উপকার।
স্বার্থতরে ব্যর্থ প্রাণ ঘৃণা কর তুমি তার,
পরের হিতে সদাই রত উচ্চ তুমি মহিমায়।
মগ্ন তুমি শ্রেষ্ঠ ধ্যানে গর্ব্ব ত্যজি সর্ব্ব কাজে,
শিক্ষা দিতে বৃক্ষ তুমি জন্মিয়াছ বিশ্বমাঝে।
সহায়হীনা লতা যবে কাতরে তব পায়,
ভিক্ষা মাগে ঊর্দ্ধমুখে তুমি বুকে লহ তায়।
জন্মে শিরে গুল্ম তাহে অষ্টমনে পুষ্ট কর,
তুচ্ছ ভাবি আপন ক্ষতি মূলগুচ্ছ বক্ষে ধর।
উদার তুমি, মহৎ তুমি, জগৎভরা দান,
আশ্রিতের রক্ষা তরে বিসর্জ্জিতে পার প্রাণ।
শত্রু মিত্রে নাইক ভেদ, সমান তব কাছে,
শিক্ষা দিতে বৃক্ষ তুমি জন্মিয়াছ বিশ্বমাঝে।
চন্দন তুমি পুষ্পপাত্রে, ইন্ধন তুমি রন্ধনে,
তরণী তুমি অর্ণবমাঝে, স্তম্ভ তুমি বন্ধনে,
হর্ম্মের আলম্বন তুমি কুটীরের ধমনী,
আসনে বসনে তুমি ব্যাপিয়া আছ ধরণী।
আহারে বিহারে তুমি, ভেষজ তুমি ব্যাধিতে,
আহবে বিভবে তুমি—(তুমি) সকল কর্ম্ম সাধিতে।
প্রয়োজন মত তুমি লিপ্ত বিশ্বহিতে,
জন্মিয়াছ বৃক্ষ তুমি বিশ্বজনে শিক্ষা দিতে।
পল্লী যবে ঝিল্লীরবে মুখরিত নিশাভাগে,
ঘুমায় জগৎ, মাঝে মাঝে শিবা সব ডাকে।
তখন তুমি পক্ষিগণে যতনে বক্ষে ধর,
আঁধার ডাকি ঘরে নিজ আনি রক্ষা কর।
নিদাঘে তুমি পথিকগণে ছায়া কর দান,
সদ্য স্বাদু খাদ্য দানে তোষ তাদের প্রাণ।
যদিও তারা তব দেহ কাটে কুঠারঘায়,
তবুও তুমি বিতর ছায়া উচ্চ মহিমায়।
শত্রু তরে ক্ষমা ভিক্ষা কর বিভুর কাছে,
শিক্ষা দিতে বৃক্ষ তুমি জন্মিয়াছ বিশ্বমাঝে।

শ্রীপঞ্চানন বসু।

বামারচনা।

সম্মিলন।

(১)

যা দিয়াছ প্রভো! দিয়াছ অনেক,
দীন আমি এত রাখিব কোথায়?
আমি তো তোমার, তব যা' আমার,
কেন দিলে প্রভো! এত বা আমায়?

(২)

অসার অনিত্যে রেখোনা রেখোনা
মায়া-বদ্ধ প্রাণে আরো মজাইয়ে,
মুক্ত কর চিত্ত মোহজাল হতে
নির্ব্বাণের পথ দাও দেখাইয়ে।

(৩)

ভবসুখরাশি. মরু মরীচিকা
না মিটায়ে তৃষা বাড়ায় দ্বিগুণ,
আমার প্রাণের নিবাও হে হরি!
ভবপিপাসার ভীষণ আগুন।

(৪)

আমি যাহা চাহি "শুদ্ধ নিরমল
শাশ্বত সুন্দর চির অনশ্বর,
জীবনে মরণে নাহি যার ক্ষয়"
সদা পূর্ণ থাক্ তাহে এ অন্তর।

৫

তব অকূরন্ত অসীমের মনে
হোক্ লয় মম সসীম জীবন,
তোমাতে আমাতে ঘুচিয়া দূরত্ব
এক হয়ে হোক্ চিরসম্মিলন।

শ্রীহেমন্ত বালা দত্ত।

বীর-সমাধি।

অনন্ত শয়নে নিভৃত নির্জ্জনে
কে গো তুমি মহামতি?
তোমার শাসনে সুখী প্রজাগণে
হে দয়াল নরপতি!
এবে কেন হায় পড়িয়া ধরায়,
অনন্ত নিদ্রায় স্থির,
নিরস ভিখারী রাজদণ্ডধারী
সম, কালকোলে, ওহে বীর,
রাজস্থান শোভা দীপ্ত তব প্রভা
অচল অটল ভবে,
জয়সিংহ বলী, মোগলকে ঠেলি,
শাসিতে প্রজায় সবে।
অন্তক শমন, করিয়া শাসন,
লয়ে যায় নিজে হ'রে,
স্মৃতিচিহ্ন যত, কাল কাছে হত,
থাকে না কিছুই প'ড়ে।

শ্রীমতী হে—জ দেবী।

প্রার্থনা।

হে পরম পিতা মাতা,
তুমি মোর ভগ্নী ভ্রাতা,
তুমিই আমার নাথ যথায় তথায়,
তোমার মহিমা যাহা,
কিছু নাহি জানি তাহা,
অজ্ঞান অবোধ আমি বিশাল ধরায়।

২

অন্ধ বোবা কর নাই,
নরের যা কিছু চাই
সকলি দিয়াছ নাথ নিজ দয়াগুণে।
কিন্তু এই দুঃখ হয়,
দেহ মোরে রিপু ছয়,
হৃদয় দগধ তাই হয় পাপাগুনে।

৩

এ ভবে করিতে ভোগ
দিয়াছ যে উপভোগ,
সে কেবল কর্ম্মভোগ আর বিড়ম্বনা।
মন তবু তাতে ধায়
অনলে পতঙ্গপ্রায়
মোহের ছলনে নাথ না ভাবি আপনা।

৪

তুমি প্রভো কৃপা করে
চৈতন্য না দিলে মোরে
কিরূপেতে মায়া-ডোর ছিঁড়িব আপনি,
যদিও আঁধার ঘোরে,
রাখিয়াছ নাথ মোরে,
তবু তব গুণে নাথ এই মাত্র জানি।

৫

তুমি নাথ নিরাকার,
তুমি সকলের সার,
এ বিশ্ব সংসার নাথ সকলি তোমার।
তোমারি করুণাবলে
আসি এই ধরাতলে
কত সুখ ভুঞ্জে নর নারী অনিবার।

৬

তুমি হও শিবময়,
তব করুণায় হয়
জীবের মঙ্গল সদা, জগতের স্বামী!
আমার মঙ্গল যাহা,
তুমিই করিবে তাহা,
আপন মঙ্গল কিছু বুঝি নাকো আমি।

৭

তুমি প্রভো নিজ গুণে,
উদ্ধারিও জ্ঞানহীনে,
অন্তিম কালেতে দিও চরণে শরণ।
ভক্তিভরে করি নাথ,
শত কোটি প্রণিপাত,
সদা যেন মনে থাকে তোমার চরণ।

শ্রীকুসুমলতা বসু।

---

৩৭ নং মধুরায়ের লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আন্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 619. — March, 1915.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫২ বর্ষ। ৬১৯ সংখ্যা। { ফাল্গুন, ১৩২১। মার্চ্চ, ১৯১৫। } ১০ম কল্প। ৩য় ভাগ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৪—শান্তম্।

১। এত বেগে পৃথিবী ঘোরে যে, আমরা তাহার বুকের উপর থেকেও তাহার বাষ্পও জানি না। অনন্ত কোটী জীবের আহারদানে তিনি অনিমেষ ব্যস্ত, কিন্তু কুত্রাপি তাহার বিন্দু-বিসর্গও দেখা যায় না।

২। তাঁহারই শক্তি অলক্ষিত ভাবে আমাদের মধ্যে থাকিয়া জগৎ-পালনের কার্য্য করে, আমরা মনে করি যে আমরাই করি। এত আত্মগোপনকারী তিনি, এবং আত্মগৌরব-প্রচারে উন্মত্ত আমি।

৩। নিদারুণ গ্রীষ্ম হতে বাঁচিবার জন্য, মানুষ রাজপথে জল ছিটায়, ফোয়ারা করে, খসখসের টাটে জল দেয়। কিন্তু এই সকল বাহ্য আয়োজনেও আশানুরূপ ফল হয় না। অন্য দিকে এই ক্লেশ দূর করিবার জন্য সেই আত্মগোপনকারীর কৌশল কেমন অদ্ভুত। অদৃশ্যভাবে বাষ্পকণা সংগ্রহ করিয়া, তিনি মেঘের সঞ্চার করেন, এবং যখন অজস্রধারে বারিবর্ষণ হয়, তখন পৃথিবীর সর্ব্বতাপ দূর হয়, এবং স্নিগ্ধ বায়ুতে আকাশ পর্য্যন্ত সুশীতল হয়। নিগূঢ় ভাবের এমন কৌশল।

৫—শিবম্।

১। উত্তাপে যখন পৃথিবীর বুক ফেটে যায়, বৃক্ষ লতা মর মর হয়, তখন কাল মেঘে আকাশের মুখ অত্যন্ত রাগপূর্ণ দেখায়। ভয়ঙ্কর বজ্রনাদে প্রাণ চমকিয়া উঠে,

তাহা দেখে তোমার কোপভাব মনে হয়। আবার বজ্রপাতে কত সময়ে গাছ পালা ভেঙ্গে যায়, পুড়ে যায়, কিন্তু ক্ষণপরেই অবিরাম জলধারায় সে সব তাপ দূর হয়, সবই সরস হয়। তাই বলি—"তোমার রাগে রাঙ্গা চক্ষুতলে বহে দেখি প্রেম সাগর।"

২। প্রসবের অসহ্য যন্ত্রণা সন্তানের চাঁদমুখের নকীব। ইহাও মঙ্গলের দূত।

৩। অসহ্য রোগ যাতনা, দুঃসহ শোক ও বার্দ্ধক্যের অসহায় অবস্থায় উদ্ধারের উপায় যে মৃত্যু তাহাও কত মঙ্গলের হেতু।

৬—অদ্বৈতম্।

১। সূর্য্যের সঙ্গে পৃথিবীর অব্যবচ্ছেদ সম্বন্ধ। তাই শীতে আধমরা হয়ে, জলে ডুবে, অগ্নিতে পুড়েও সে মুখ অন্য দিকে ফিরায় না। তারই উপর তার সম্পূর্ণ নির্ভর বলে আবার তার বুকে বসন্ত-সমাগমে কতই সুখের আয়োজন হয়।

২। এখানে সূর্য্য অদৃশ্য হয়, অমনি আঁধার, বিষাদ ও ভয় উপস্থিত হয়। কিন্তু অন্য স্থানে সুপ্রভাত হয়, অরুণ-ভাতি প্রকাশ পায়, প্রাতে পক্ষী আনন্দ-রবে উন্মত্ত হয়, জগতে নবজীবনের স্রোত বহিয়া যায়। উদয় ও অস্তে, চিরদিনই সে, সেই একই আকাশের —একই পৃথিবীর পানে চায়।

৩। সকল মূল্যেরই মূলাধার এক। এই একেরই দ্বারা সর্ব্ব রাশির উৎপত্তি। যে শূন্যের কোন মূল্যই নাই, এই একের পশ্চাতে তার মূল্য দশ গুণ, শতগুণ ইত্যাদি। নির্গুণ মানুষ সেই একের পশ্চাতে আসিলে এইরূপে অসীম পরিমাণে তাহার গুণ ও মূল্য বাড়িয়া যায়। আবার একের ঠিক কাছ থেকে যে শূন্য যত দূরে, তার মূল্য ততই বেশী হয়।

৭—শুদ্ধম্।

১। নিষ্পাপ হয়ে শিশু জগতে আসে। সে ছলনা, কপটতা জানে না। অশুদ্ধ নরনারীর নিকট সেই শুদ্ধমপাপবিদ্ধমের একটু আভাস দিবার জন্য শিশু জন্মে। সে স্বর্গের সুসমাচার-বাহী দেবদূত।

২। অক্ষম শিশু আপনার মলমূত্রে আপনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। অন্যের ঘৃণা হতে পারে, কিন্তু মায়ের পক্ষে তা অসম্ভব, তিনি ধুয়ে পুঁছে তাহাকে কোলে তুলে লন। এ সব কেবল দুর্ব্বল মানবের ও

পতিতপাবনী বিশ্বজননীর সম্বন্ধ বুঝাবার জন্য। শিশুর এই দৃশ্য তাঁহারই অভয় বাণী।

৩। মা ভাল কাপড় চোপড় পরাইয়া সন্তানকে স্কুলে পাঠান, সে কালি-ধুলা মেখে, কাপড় ছিঁড়ে বাড়ী আসে। মা জল দিয়ে, গামছা দিয়ে সব ধুয়ে দেন। আঁচল দিয়ে তাহার গা পুছান, এবং সময়ে সময়ে একটু ভৎসনাও করেন। ইহাই পাপীর ভরসা। মা স্বহস্তে তাহার পাপ-কালি ধুলা ধুয়ে দেন।

বারাণসীতত্ত্ব।

পঞ্চম অধ্যায়।

নদীসম্মুখস্থ কোতয়ালী।

কোতয়ালী-মহল্লার প্রথমেই রামঘাট। এখানে সোপানোপরি একটি মন্দির আছে, তাহাতে অনেকগুলি দেবমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। ইহাদিগের মধ্যে কাহারও চক্ষু, কাহারও বা বদন বৃহৎ এবং কেহ কেহ হস্তপদহীন। মূর্ত্তিগুলি দেখিতে কুৎসিত। এই দেবমূর্ত্তিগুলির পরিধানে সোনালি রঙ্গের বস্ত্র। চৈত্রমাসে রামনবমীর সময় এই ঘাটে বহু লোক স্নান করিয়া থাকে। প্রাতঃকালে ধনী, দরিদ্র, স্ত্রী ও পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই এই ঘাটে স্নান করিয়া রামচন্দ্রের পূজা করিয়া থাকে। এই স্থানে বদমায়েসেরা ভদ্রমহিলাদিগকে লাঞ্ছিত করিয়া থাকে। সুতরাং হিন্দু-মহিলাগণ এখানে আসিয়া সাবধানে থাকিবেন। এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক ঘাট আছে, যথা মঙ্গলা, গৌরী এবং দলপত ঘাট। ইহার পরেই পঞ্চগঙ্গা ঘাট। এই ঘাটটী পঞ্চতীর্থের মধ্যে একটী তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। হিন্দুগণ এই ঘাটকে পবিত্র বলিয়া ভক্তি করেন, কারণ তাহা-দিগের বিশ্বাস এই যে, এই স্থানে গঙ্গার সহিত অন্তঃসলিলা স্রোতস্বতীচতুষ্টয় যথা—ধূতপাপ, কিরণনদী, যমুনা নদ এবং সরস্বতী—আসিয়া মিলিত হইয়াছে। প্রবাদ এই যে, ধোরতপাপ নামে এক কুমারী ছিলেন। তিনি ক্রোধপরবশ হইয়া স্বীয় ভাবী পতিকে ধর্ম্মনদে পরিণত করেন। তাঁহার স্বামীও প্রতিহিংসালোলুপ হইয়া তাঁহাকে এক পাহাড়ে পরিবর্ত্তিত করেন। পরন্তু কুমারীর পিতা বেদাস্থর কৃপাপরবশ হইয়া স্বীয় কন্যাকে চন্দ্রকান্ত নামক প্রস্তরবিশেষে পরিণত করেন। চন্দ্র-কিরণে চন্দ্রকান্তর প্রস্তর বিগলিত হইয়া নদীতে পরিণত হয়। এই নদী ধর্ম্ম-পত্নী। কিরণ নদী সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, সূর্য্যদেব যখন মঙ্গলগৌরীর পূজায় ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তাঁহার ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া নদীতে পরিণত হয়। এই নদীই কিরণ নদী নামে খ্যাত। ঘাটটী প্রশস্ত এবং

তাহার মধ্যে যে সকল গম্বুজ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের প্রত্যেকটী এক একটী দেবালয়। ঘাটের উপরে লক্ষ্মণবালা নামে একটী বৃহৎ অট্টালিকা আছে। এখানে ভক্তবৃন্দ সমাগত হইয়া মালা জপ করেন। গীতবাদ্যও বাদ যায় না। ঘাটের নিম্নদেশে কল্লোলিনীর কলনাদ এবং উপরে মনোমুগ্ধকারী তানলয়-সমন্বিত সঙ্গীত কর্ণকুহরে পীযূষ বর্ষণ করিয়া থাকে। মন্দিরের ভিতর ত্রিমূর্ত্তি এক সারে বিরাজিত। মধ্যস্থিত মূর্ত্তির নীল পরিচ্ছদ, মস্তকে নীল বর্ণের পাকড়ি, এবং গলদেশে মালা দোদুল্যমান। ইঁহার বাম দিকে গিল্টি করা একটি চক্র দেওয়ালের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে, তাহাতে নাক, কান, মুখ এবং চক্ষু দেখিতে পাওয়া যায়। ইটি সূর্য্যদেবের প্রতিমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির দক্ষিণ পার্শ্বে আর একটি চক্র আছে, তাহা চন্দ্রদেবের প্রতিনিধি। মূর্ত্তির সমক্ষে একটি দীপ জ্বলিয়া থাকে। ভক্তগণ এখানে সমাগত হইয়া পূজা করিয়া থাকেন। ঘাটের উত্তরপূর্ব্ব দিকে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের একটি মসজিদ আছে, তাহা অধুনা মাধোদাসের দেওয়া নামে খ্যাত। মসজিদটীর অত্যন্ত পাকা গাঁথুনি। ইহাতে শিল্পকার্য্যের কারিকুরি না থাকিলও উপরিভাগটী দেখিবার বস্তু। ইহার চূড়া ১৪২ ফিট উচ্চে অবস্থিত। প্রথমে উহা আরও ৫০ ফিট উচ্চ ছিল, পরন্তু ভাঙ্গিয়া পড়িবার আশঙ্কায় প্রিন্সেপ্ সাহেব তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলান। এখনও উহা ১৪ ইঞ্চি হেলিয়া আছে। এই মসজিদে মুসলমানগণ কম যান। ঔরঙ্গজেবের নিযুক্ত মোল্লার অনেক বংশধর এই মসজিদের মালিক। মসজিদের সংস্কার ইংরাজরাজই করিয়া থাকেন এবং ইহার ব্যয় সরবরাহের জন্য পুরাকাল হইতে একটি গ্রাম নির্দ্দিষ্ট আছে। পঞ্চগঙ্গা ঘাটের পরই প্রসিদ্ধিহীন লাল সীতলা ঘাট, লাল ঘাট এবং গাইঘাট।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

নদীসম্মুখস্থ আদমপুরা।

প্রথমে যে শত-মহল্লার কথা বলা হইয়াছে, তাহার পরই নদীর সমক্ষে যে অবশিষ্ট অংশ আমাদিগের নয়নপথে পতিত হয়, তাহার নাম আদমপুরা। ইহা পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখানে ঘাটের সংখ্যা কম এবং তাহাদিগের প্রসিদ্ধিও নাই। প্রথমেই মহারাষ্ট্রীয়-রাজকুমারী বালা বাইয়ের ঘাট এবং ইহার অনতিদূরে ত্রিলোচন ঘাট। শেষোক্ত ঘাটটীতে ত্রিলোচন-দেবের মন্দির অবস্থিত। এই হেতুই ঘাটের নাম ত্রিলোচন ঘাট হইয়াছে। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী রাজকুমারী নাথুবালা। প্রবাদ এই যে, যখন মহাদেব ধ্যানমগ্ন ছিলেন, তখন বিষ্ণু সহস্র প্রকারের ফুল লইয়া আসিয়া তাঁহার পূজা করিতেন। একদা বিষ্ণু পূজার জন্য ফুল লইয়া আসিয়া রাখিয়াছেন, দৈবযোগে তাঁহার দৃষ্টি কোন বস্তুর উপর আকৃষ্ট হইল। এই অবকাশে মহাদেব

একটি ফুল হরণ করিয়া লইলেন। বিষ্ণু পুনরায় পূর্ব্ববৎ পূজা করিতে লাগিলেন এবং গণিয়া গণিয়া ফুল অর্পণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখনই দেখিলেন যে তাঁহার একটি ফুল কমিতেছে, তখন তাঁহার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি নিজের একটি লোচন উৎপাটিত করিয়া অর্পণ করিলেন। অমনি মহাদেবের মূর্ত্তিতে চক্ষুটী লাগিয়া গেল। তখন মহাদেব ঘটনা-স্রোত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তদবধি তাঁহার ত্রিনেত্র হইল। দ্বিতীয় প্রবাদ এই যে, শিবলিঙ্গ সপ্তপাতাল প্রদক্ষিণ করিয়া এই স্থানে আসিয়া অব-স্থিত হইল। গৌরী মহাদেবের অন্বেষণে ফিরিতেছিলেন। মহাদেব স্বীয় তৃতীয় চক্ষুদ্বারা গৌরীকে নিরীক্ষণ করিয়া-ছিলেন। লোকের বিশ্বাস এই যে, উক্ত মন্দিরের নিকট গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতীর ত্রিবেণীসঙ্গম হইয়াছে। অধিকন্তু সরস্বতীশ্বর, যমুনেশ্বর এবং নর্ম্মদেশ্বর—এই তিনটি দেবতা এখানে অবস্থিতি করেন। প্রথম মূর্ত্তিদ্বয় এখানে অবস্থিত, পরন্তু শেষোক্ত দেবতার মন্দির কিছু দূরে। বৈশাখ মাসে যে ব্যক্তি ত্রিলোচন দেবের মন্দিরে একদিন দিবা-রাত্র পূজা করে, সে মুক্ত হইয়া যায়। দেওয়ালে গদাকৃতি একটি দেবতা বিরাজ করিতেছেন, তিনি উচ্চে তিন ফিট এবং তাঁহার ব্যাস এক ফুট। ইনি কোটী লিঙ্গেশ্বর নামে [illegible]াত। দক্ষিণপশ্চিম কোণে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে, তাঁহার নীচে হনুমানের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। নিকটেই গণেশ এবং শীতলার মূর্ত্তি দেওয়ালে সংলগ্ন রহিয়াছে। দক্ষিণে বারাণসী নামে একটি দেবতা দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা বনার ইঁহার প্রতিষ্ঠাতা। গণেশ এবং সূর্য্যদেবেরও মূর্ত্তি এখানে আছে, পরন্তু ইহাঁদিগের বিগ্রহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র।

ত্রিলোচনের মন্দিরের ছাত আটটী স্তম্ভের উপর স্থাপিত। মন্দিরটী ছবি দ্বারা সজ্জিত। মন্দিরের দ্বারের বিপরীত দিকে শ্বেতপ্রস্তরের একটী সাঁড় শুইয়া আছে। উপরে দুইটী ঘণ্টা ঝুলিতেছে। পূজান্তে লোকেরা এই ঘণ্টা বাজাইয়া থাকে। মন্দিরে গণেশদেবের মূর্ত্তি শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত। নারায়ণ এবং লক্ষী-দেবীর মূর্ত্তিও সেখানে বিরাজমান। মন্দিরাভ্যন্তরে লিঙ্গেশ্বর এবং পার্ব্বতীর মূর্ত্তি আছে, ইহাদিগের সমক্ষে দীপ প্রজ্বলিত থাকে।

ত্রিলোচনঘাটের অপর একটি নাম পিলপিল তীর্থ। জলনিমজ্জিত দুইটি গম্বুজের মধ্যে লোকে স্নান করিয়া থাকে। এই ঘাটই শেষ ঘাট বলিয়া পরিগণিত। এতদ্ব্যতিরিক্ত মধুঘাট, তিলিয়া নালা ঘাট এবং প্রহ্লাদ ঘাট নামে তিনটি ঘাট আছে, পরন্তু তথায় লোকসমাগম অত্যন্ত অল্প।

গাইঘাটের সন্নিকটে নির্ব্বুদেশ্বরের মন্দির। এই মন্দিরটী শিল্পকার্য্য-বিহীন।

দ্বিতীয় মন্দিরটীর নাম আদি মহাদেব। এখানে ব্যাসমঞ্চ আছে, কথকতাও হইয়া থাকে। এখানে পার্ব্বতীশ্বরীর একটী মূর্ত্তি বিরাজমান। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, গোরজীনামক জনৈক ব্রাহ্মণ পার্ব্বতীশ্বরীর মন্দির নির্ম্মাণ করেন। উক্ত পণ্ডিত মহাশয় কাশীখণ্ড পাঠ করিয়া লুপ্ত-দেবদেবীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

ডফরিণ সেতুর নিকটে রাজঘাট। কিন্তু এ ঘাটটী স্নানের জন্য নহে। উক্ত সেতুনির্ম্মাণের পূর্ব্বে নৌকারোহিগণকে এই স্থানে নামিতে হইত। এই স্থানে যে ডাকবাঙ্গালা দেখা যায়, তাহা চুগি অফিস্ ছিল। এই স্থানে নৌকারোহিগণকে মাসুল দিতে হইত। সেতুর উচ্চ তটে রাজা বনারের নির্ম্মিত বহু পুরাতন রাজঘাটগড় আছে। সিপাহীবিদ্রোহের সময় ইহা নূতন করিয়া নির্ম্মিত হয়, কিন্তু ইহাতে সেনা থাকিত না। ইহার পরের তটটী গঙ্গা এবং বরুণা সঙ্গমের সন্নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। এই স্থানে কতকগুলি ভগ্ন অট্টালিকা অবস্থিত। বরুণাসঙ্গম অতি পবিত্র স্থান বলিয়া পরিগণিত। এথানেও একটি ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল। স্নানের নিমিত্ত যে স্থানপঞ্চক আছে, তন্মধ্যে ইহাই অন্তিম স্থান এবং পঞ্চকোশী তীর্থের একটি অংশ মাত্র। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী হেমন্ত কুমারী দেবী।

বর্ত্তমান বঙ্গীয় মহিলাসমাজের শিক্ষা—তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও বিস্তারের প্রকৃষ্ট উপায়।*

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৪) বিলাসিতা—আমরা পাশ্চাত্য-দেশবাসিগণের গুণগুলি অনুকরণ করিতে পারি আর না পারি, অন্যান্য বিষয়ে অনায়াসেই তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া থাকি। আমরা এরূপ ভাবে অনুকরণ করি যে, সেগুলি আর সহজে পরিত্যাগ করিতে পারি না।

আমাদিগের ভারত পূর্ব্বে কর্ম্মপ্রবণতার

---

* এই প্রবন্ধ-সম্বন্ধে পাঠকগণের মতামত এবং যে যে বিষয়ের সহিত তাঁহাদের মতের মিল না হয় তাহার প্রতিবাদ পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব। শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, এজন্য এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। বা, বো, স।

আধারভূত ছিল। আর্য্য রমণীগণ ঐহিক সুখের জন্য, বাহ্যিক পারিপাট্যের জন্য এবং বেশ ভূষার জন্য লালায়িত ছিলেন না। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য-সভ্যতালোক-প্রাপ্ত বঙ্গ-রমণীগণ বিলাসিতার গভীর পঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছেন। তাঁহাদিগের আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। বিলাসিতাই দেশের অবনতির মূল। বিলাসিতার দ্বারা দেশ-বাসিগণ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। বিলাসিতা হইতেই ক্রমে ক্রমে আলস্যের উদ্ভব হয়। ইহা দেশের উন্নতির কণ্টকস্বরূপ। কেহ হয়ত বলিবেন যে, পাশ্চাত্যদেশীয়গণত বিলাসী, তবে তাহারা এত উন্নত কেন? ইহার উত্তর—পাশ্চাত্যদেশবাসিগণ যে পরিমাণে বিলাসী, তাহারা ততোধিক পরিমাণে কর্ম্মপ্রবণ। আমরাও যদি তাহাদিগের ন্যায় কর্ম্মপ্রবণ হইতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাদিগের ন্যায় উন্নত হইতে পারিব। কিন্তু কর্ম্ম প্রবণতারদিকে আমরা অন্ধ, অনুচিকীর্ষু বাঙ্গালীর সে দিকে দৃষ্টি নাই, তাহারা দোষ গুণ বিচার না করিয়া কেবল অনুকরণই করে। যাহা হউক, আমাদিগের বিলাসিতা পরিত্যাগ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

(৫) গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম ও আলস্য—বর্ত্তমান কালের অধিকাংশ শিক্ষিতা মহিলা গৃহকর্ম্মে অবহেলা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারা যেন গৃহ-কর্ম্মগুলিকে অতি নিকৃষ্ট কার্য্য বলিয়া মনে করেন। পূর্ব্বকার লোকেরা স্ত্রীলোকদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেন—"দ্রৌপদীর ন্যায় রন্ধন কার্য্যে পারদর্শিনী হও।" এখন যদি কেহ ঐ আশীর্ব্বাদ করে, তাহা হইলে, লোকে তাহাকে "Old fool" বলিবে। এক্ষণে প্রায় অনেক বাটীতেই পাচক ব্রাহ্মণ আছে। যদি কোন বিশেষ কারণে, ঐ পাচক ব্রাহ্মণ একদিন অনুপস্থিত হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিতা মহিলার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত পতিত হয়।

মনু বলিয়াছেন—

"সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া।
সুসংস্কৃতোপস্করয়া ব্যয়ে চামুক্তহস্তয়া॥"

ইহার অর্থ—স্ত্রীলোকগণ সর্ব্বদা হৃষ্টান্তঃকরণে গৃহকর্ম্মে দক্ষতা প্রকাশ করিবেন। তাঁহারা গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবেন ও পরিমিত-ব্যয়শীল হইবেন।

মনু গৃহকর্ম্ম হৃষ্টান্তঃকরণে করিতে উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু গৃহকর্ম্মের নাম শ্রবণেই এখন অনেক রমণীর হৃদয়ে বিষাদের আবির্ভাব হয়। আর বিলাসিনী হইলে কিছুতেই মিতব্যয়শীল হওয়া যায় না। বর্ত্তমান যুগের অধিকাংশ মহিলার কার্য্যের মধ্যে দেখা যায়, ইজি চেয়ারে অথবা সোফাতে অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় নভেল-নাটক পাঠ করা, কিম্বা উল লইয়া বয়ন করা। কাহারও বা অত্যধিক মস্তিষ্ক চালনায় ঘন ঘন হিষ্টিরিক্ ফিট্ হইতে দেখা যায়। বর্ত্তমান কালের মহিলাগণ কোন প্রকার ব্যায়াম করেন না বলিয়া তাঁহাদিগের এই সকল ব্যাধি হইয়া থাকে। ফুট্‌বল্, ব্যাট্ বল্,টেনিস্, হকি, পোলো,

প্রভৃতি ক্রীড়া অথবা ডাম্বেল-ভাঁজা ভিন্ন যে ব্যায়াম হয় না, ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। আমাদিগের গৃহকর্ম্মগুলি করিলেই যথেষ্ট ব্যায়াম করা হয় এবং এইরূপ ব্যায়ামই স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ উপযুক্ত।

(৬) আদর্শ—আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান কালের কোন মহিলা যদি পরোপকারব্রতধারিণী হন, তাহা হইলে তিনি কুমারী নাইটীঙ্গেলকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিবেন কেন? আমাদিগের পুরাণ ইতিহাসে কি কোন আদর্শ চিত্র অঙ্কিত নাই? আদর্শস্থানীয় করিতে হইলে, আমাদিগের দেশের স্বদেশপ্রাণা পরদুঃখমোচনে চেষ্টিতা, কোন প্রাচীন কালের রমণীকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে হইবে,—পাশ্চাত্য দেশের নহে। পাশ্চাত্যদেশের আদর্শকে শত চেষ্টা করিলেও আমরা আমাদের করিয়া লইতে পারিব না। আমাদিগের আদর্শ আমাদিগেরই উপযুক্ত।

আমরা এতক্ষণ কেবল বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালীর দোষই আলোচনা করিলাম। বর্ত্তমান-স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালীর গুণ যে কিছুই নাই, তাহা নহে। কিছুদিন পূর্ব্বে অর্থাৎ ইংরাজ-শাসনের পূর্ব্বে দেশে যে পরিমাণে অশিক্ষিতা রমণী ছিলেন, এক্ষণে আর তত নাই,—ইহাই আমাদের পরম আনন্দের বিষয়। তবে বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষার সহিত বর্ত্তমান পুরুষদিগের শিক্ষার বিশেষ কিছু প্রভেদ নাই। স্ত্রীলোকেরা প্রায় পুরুষদিগের ন্যায়ই শিক্ষিতা হইতেছেন। এইজন্য তাঁহারা পুরুষদিগের জীবন-সংগ্রামের সঙ্গিনী হইতে পারেন। ইহাও একপক্ষে কম কৃতিত্বের পরিচয় নহে। বর্ত্তমান-শিক্ষাপ্রণালী যে উচ্চাঙ্গের, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে আমাদের মতে যাহা যাহা দূষণীয় বলিয়া বোধ হয়, তাহাই অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম।

আদর্শ শিক্ষা ও তাহার বিস্তারের উপায়।

এক্ষণে দেখা প্রয়োজন যে, কিরূপ প্রণালীতে শিক্ষা প্রদত্ত হইলে তাহা "আদর্শ শিক্ষা" বলিয়া গণ্য হইতে পারে। অবশ্য এক এক দেশের, এক এক ধর্ম্মাবলম্বীর, এক এক সমাজের আদর্শ এক এক প্রকার। মূলতঃ সকলেরই এক উদ্দেশ্য। তবে আমাদের বঙ্গদেশের প্রণালী বঙ্গের ন্যায়ই হওয়া উচিত। বঙ্গের আদর্শ একমাত্র বঙ্গই হওয়া উচিত। যে শিক্ষা দ্বারা জাতীয় উন্নতি, ধর্ম্মজীবন ও গার্হস্থ্য-জীবন সুচারুরূপে গঠিত হইতে পারে, সুখের হইতে পারে, তাহাই প্রকৃত আদর্শ-শিক্ষা।

১। স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন—প্রত্যেক পল্লীতে এক একটী করিয়া স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। পাশ্চাত্যদেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য যত অর্থব্যয় হয়, আমাদিগের ভারতে তদ্রূপ অর্থব্যয় হয় না। সম্প্রতি বরোদার গায়োকবার নিয়ম

করিয়াছেন যে ১৫ জন পাঠার্থী বালক বা বালিকা একটী গ্রামে থাকিলেই তথায় একটী স্কুল খুলিতে পারিবে। তাহার অধিকাংশ ব্যয়ভারও গায়োকবার স্বয়ং বহন করিবেন। আমাদিগের দেশে যদি ঐরূপ নিয়ম প্রচলিত হয়, তাহা হইলে অচিরে প্রভূত মঙ্গল হইবে। আমাদিগের মতে বিনা বেতনে সাধারণ লোকের পুত্র কন্যাকে বিদ্যাদান করা কর্ত্তব্য, এবং বৎসরান্তে উৎসাহ-প্রদর্শনার্থ তাহাদিগকে পুস্তক ও নানাবিধ দ্রব্যাদি পারিতোষিক প্রদান করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক গ্রামে এক বা ততোধিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। এক গ্রামের অধিবাসিনীগণ শিক্ষিত হইবেন, আর অপরগ্রামবাসিনীগণ অশিক্ষিত থাকিবেন, ইহা হইতেই পারে না। বিদ্যালয়গুলি আকারে ছোট হয়, তাহাতে কিছু দোষ নাই, কিন্তু সংখ্যায় অত্যধিক হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে যদি কোনও গ্রামের অধিবাসিগণ সমবেত-চেষ্টার দ্বারা একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে নানা কারণে বিশেষ বেগ পাইতে হয়।

যাহা হউক, প্রত্যেক নগরে এক একটি করিয়া বড় বিদ্যালয় থাকিবে। জেলা বড় হইলে, প্রত্যেক দশ বারটি গ্রাম লইয়া এক একটি বড় বিদ্যালয় গঠিত হইবে। এ গুলির উপর ইউনিভার্সীটি বা শাখা ইউনিভার্সিটী থাকিবে।

হিন্দু সমাজের অনেকে বালিকাদিগকে বা গৃহিণীদিগকে স্কুলে পাঠাইতে ইচ্ছা করেন না বা তাঁহাদিগকে পাঠাইবার সুযোগ হয় না। এইরূপ ক্ষেত্রেও শিক্ষা প্রচার করা আবশ্যক, এইজন্য অন্তঃপুর-শিক্ষার প্রচলন করিতে হইবে। অর্থাৎ অন্তঃপুরচারিণীগণকে সুবিধামত তাঁহাদিগের বাটীতে গিয়া পড়াইয়া আসা এবং গল্পচ্ছলে নানা বিষয়ের উপদেশ দেওয়া আবশ্যক। আমরা কি বিদ্যালয়ে, কি অন্তঃপুরে শিক্ষক অপেক্ষা শিক্ষয়িত্রীর উপযোগিতা অধিক পরিমাণে উপলব্ধি করি।

প্রত্যেক বিদ্যালয়ে আবশ্যক দ্রব্য-গুলিও রাখিতে হইবে। একটী নিত্য-আবশ্যক পুস্তকালয় প্রত্যেক স্কুলে রাখিতে হইবে। আর বরোদার গায়কোবার যেরূপ লাইব্রেরীর প্রচলন করিয়াছেন, সেইরূপ করিতে পারিলে অত্যন্ত উপকার হয়। তিনি চক্রযুক্ত দুই তিন শত গাড়ি প্রস্তুত করাইয়া, তাহাদের প্রত্যেকটী পাঁচ শত করিয়া উৎকৃষ্ট পুস্তকে পরিপূর্ণ করাইয়াছেন। প্রত্যেক গাড়িতেই পৃথক পৃথক পুস্তক। অর্থাৎ এক গাড়িতে যে পুস্তক আছে, অন্য গাড়িতে তাহা নাই। একখানি গাড়ি একটি গ্রামে আইসে এবং সেই স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময় থাকে। সেই গ্রামবাসীদিগের সেই পুস্তকগুলি পাঠ করা হইয়া যাইলে অপর গ্রামে সেই গাড়ী চলিয়া যায়। আবার নূতন গাড়ী সেই গ্রামে আইসে। এইরূপে সমগ্র দেশে বিদ্যার প্রচার হয়।

২। পাঠের সময়—

সাধারণতঃ প্রাতে ও বৈকালে বিদ্যালয়ের কার্য্য হইবে। প্রাতঃকালে বালিকারা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে বিদ্যালয়ে যাইবে। ৬॥০ ঘটিকা হইতে দশম ঘটিকা পর্য্যন্ত পাঠ অভ্যাস করিবে। তাহার পর গৃহে গমন করিয়া স্নানাহার করিবে। আহারের পর কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পূর্ব্বদিন শিক্ষয়িত্রী যে হস্তলিপি, চিত্র ও সীবন-কার্য্য শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার অনুশীলন করিবে। আবার চারি ঘটিকার সময় বিদ্যালয়ে গমন করিয়া ছয় ঘটিকার সময়ে বাটীতে ফিরিয়া আসিবে। প্রয়োজন হইলে রাত্রিতে ম্যাজিক-লণ্ঠন দ্বারা নানা প্রকার প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে। অথবা গল্পচ্ছলে বালিকাগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

৩। বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় বিষয়—

কাব্যাদি সহিত।

- বঙ্গভাষা ও তাহার ব্যাকরণ।
- সংস্কৃত-ভাষা ও তাহার ব্যাকরণ।
- ইংরাজী ভাষা ও তাহার ব্যাকরণ।

বঙ্গভাষায় বিস্তৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস।

" " " ভূগোল।

" " প্রত্যেক মহাদেশের পৃথক পৃথক ইতিহাস।

" " প্রত্যেক মহাদেশের পৃথক পৃথক ভূগোল।

" সংক্ষিপ্ত পৃথিবীর ইতিহাস।

বঙ্গভাষায় সংক্ষিপ্ত পৃথিবীর ভূগোল।

সংক্ষিপ্ত

- বিজ্ঞান (যত প্রকার আছে)।
- দর্শন (দেশীয় ও বিদেশীয়)।
- চিকিৎসা শাস্ত্র (দেশীয় ও বিদেশীয়)।

অঙ্ক শাস্ত্র—ব্যবসায় ও বাণিজ্য—রাজনীতি—অর্থনীতি—ধর্ম্মনীতি—সমাজনীতি—প্রত্ন-তত্ত্ব—ভাষা-তত্ত্ব— ভূতত্ত্ব—খগোল প্রভৃতি—ইঞ্জিনিয়ারিং—চিত্র শিল্প—কারুকার্য্য—সঙ্গীত—রন্ধন-প্রণালী—গৃহকার্য্য প্রভৃতি।

৪। পাঠ্য-পুস্তক-নির্ব্বাচন—

শিক্ষা সম্বন্ধে সকল বিষয়েই গভর্ণমেণ্টের পরামর্শ লওয়া উচিত, তবে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা থাকাও প্রার্থনীয়। বর্ত্তমান সময়ে পাঠ্য-নির্ব্বাচক-সমিতি-কর্ত্তৃক যে সকল পুস্তক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, তাহা যথাযথ হয় না। দেশের স্বনামখ্যাত বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ দ্বারা পাঠ্য পুস্তক লেখাইয়া লওয়া উচিত। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে এ কাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের একখানি প্রকৃত ইতিহাস প্রণয়ন হইল না। অনেক সময় ইতিহাসে সত্য ঘটনা অপ্রকাশিত থাকে। আমাদিগের মতে প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব এরূপ ভাবে অপ্রকাশিত রাখা উচিত নহে।

৫। আলোচনা—(শিক্ষণীয় বিষয়-সম্বন্ধে)

অধিকাংশ পুস্তকই আমাদিগের মাতৃভাষায় লিখিত হওয়া প্রয়োজন, যেহেতু বিষয়-সমূহ যতই গুরুতর ও জটিল

হউক না কেন, মাতৃভাষায় লিখিত হইলে তাহা সহজেই বোধগম্য হয়, আর সাধারণ লোকেও নানা বিষয় জ্ঞাত হইতে পারে। প্রথমতঃ আমাদিগের মাতৃভাষা উত্তমরূপে জানা আবশ্যক, তাহার পর প্রাচীন ভাষা সংস্কৃতের অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। ইংরাজী-ভাষা সকলেরই শিক্ষা করা অতীব প্রয়োজনীয়, যেহেতু ইংরাজী ভাষা রাজকীয় ভাষা এবং ভারতের নানা প্রদেশেও এই ভাষার বিস্তৃতি হইয়াছে। কেবল ভারত কেন, পৃথিবীর অনেক স্থানেই এই ভাষা প্রচলিত। এক কথায় বলিতে গেলে ইংরাজী ভাষাকে সর্ব্বজনীন ভাষা বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। যাহা হউক, সর্ব্বসাধারণেরই ইংরাজী ভাষায় লিখিত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে ও অনর্গল কথোপকথন করিতে পারা উচিত। ইতিহাস পাঠ করা আমাদিগের অতীব প্রয়োজনীয়, যেহেতু প্রাচীন ইতিহাস পাঠে, আমাদিগের পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ হয়—তাহাতে আমাদিগের হৃদয় সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইবে। বৈদেশিক-ইতিহাস পাঠেরও প্রয়োজন আছে, কারণ সেই সকল দেশ কিরূপে উন্নতি ও অবনতির ঘাত প্রতিঘাতে স্থির থাকিয়া এইরূপ সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে তাহা জানিবার ও ভাবিবার বিষয়। বিজ্ঞান আমাদিগের বিশেষ প্রয়োজনীয়, বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ভিন্ন দেশের উন্নতি সম্ভবে না। পাশ্চাত্য-দেশের এত উন্নতির অন্যতম কারণ—বিজ্ঞানের অদম্য পুরুষানুক্রমিক অনুশীলন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ নিত্য নব নব বিষয় আবিষ্কার করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত ও বিস্মিত করিতেছেন। আমাদিগের দেশের পল্লিপল্লীতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার (laboratory) স্থাপিত হউক, তাহা হইলে আমাদিগের দেশবাসিগণও অনাবিষ্কৃত প্রয়োজনীয় বিষয়-সমূহ নিত্য আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিবে। চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধেও সকলের অল্প বিস্তর জ্ঞান থাকা উচিত। অন্ততঃ স্বাস্থ্যতত্ত্বের মূল সূত্রগুলি সকলেরই জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। অর্থনীতি, ব্যবসায় ও বাণিজ্যনীতি বিশেষভাবে অনুশীলন-যোগ্য। সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি অতি সরলভাবে বক্তৃতাচ্ছলে শিক্ষা দিলে মন্দ হয় না। ইঞ্জিনীয়রিং সকলেরই অল্প বিস্তর জানা আবশ্যক। রন্ধনপ্রণালী ও গৃহকার্য্য এমন কি "খুটীনাটী" কার্য্য পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত। ভারত পূর্ব্বে শিল্পগৌরবে গৌরবান্বিত ছিল, অদ্য তাহা বিলুপ্তপ্রায়, সেই জন্য সকলেরই কিছু কিছু শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করা প্রয়োজন। সঙ্গীতশাস্ত্রও কিছু অনুশীলন করা প্রয়োজন। সঙ্গীতের আলোচনায় মন প্রফুল্ল হয়। এই সমস্ত বিষয়ে যাহাতে উত্তমরূপে শিক্ষা প্রদান করা যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

মন্তব্য।

মহিলাগণের দয়া, মায়া, ভালবাসা

ইত্যাদি পুরুষদিগের অপেক্ষা অধিক বলিয়া বোধ হয়। আমরা মহিলাদিগকে পুরুষদিগের ন্যায় শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করি না। যাহাতে তাঁহাদিগের দয়া, সহিষ্ণুতা, ও কোমলতা প্রভৃতি গুণগুলি সমধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত ও বিকশিত হয়, তাহার চেষ্টা করা ও তাঁহাদিগকে সেই প্রকার শিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য। মহিলাগণের প্রকৃতি যেমন পুরুষ হইতে ভিন্ন, সেইরূপ তাঁহাদিগের শিক্ষাও বিভিন্ন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। পুরুষজাতিকে পুরুষপ্রকৃতির শিক্ষা ও নারীজাতিকে নারী-স্বভাবোপযোগিনী শিক্ষা দান করাই জনসমাজের মঙ্গলের উপায়। ইহার অন্যথা করিলে সমাজ ও দেশের বিষম অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে। মহিলাগণ পুরুষপ্রকৃতি লাভ করিয়া লজ্জা, মধুরতা, সৌকুমার্য্য ও বিনয় প্রভৃতি গুণে ক্রমেই হীন হইয়া পড়িবেন। আমাদিগের মতে মহিলাগণকে বিভিন্ন প্রণালীর শিক্ষা প্রদান করা নিতান্তই আবশ্যক। তবে এরূপ শিক্ষা হওয়া উচিত যে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ে উভয়কে সাহায্য করিবে। রমণী-সুলভ সরলতা ইত্যাদির সহিত পুরুষের ন্যায় অন্যায় বিচার ইত্যাদি মিলিলে শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে। সাধারণের উপকার হয়, সর্ব্বদা এরূপ শিক্ষাদান করা কর্ত্তব্য, যথা ঃ—রন্ধন, সীবন, গৃহকার্য্য ইত্যাদি।

পূর্ব্বে আমরা বিদ্যাশিক্ষার সময় ও বিদ্যালয়ের গঠন সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছি তাহা কোন কোন স্থলে কার্য্যতঃ হইতেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারা যায় যে, বঙ্গের উজ্জ্বল রত্ন কবীন্দ্র রবীন্দ্র নাথের 'বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম" ও হরিদ্বারের "গুরুকুল সমাজ" অনেকটা এই প্রণালীতে শিক্ষা-দান করিতেছেন। এই সকল বিদ্যালয়ই অনেকটা আদর্শ বিদ্যালয় বলিয়া কথিত হইতে পারে। সরস্বতীর অবতার স্বরূপা শ্রীমতী সরলা দেবী যে, সমগ্র ভারতের জন্য স্ত্রী-শিক্ষামণ্ডল স্থাপন করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের মতের অনুকূল, তবে তাহা একেবারে ত্রুটি-বিচ্যুতি-পরিশুদ্ধ নহে। তিনি যদি উহা হিন্দুদিগের উপযোগী করিয়া, ধর্ম্মশিক্ষার সহিত ঐ শিক্ষা প্রদান করেন, তাহা হইলে সমগ্র দেশ-বাসীর মঙ্গল হইবে ও তাঁহার শিক্ষাসংঘ সর্ব্ববাদিসম্মত হইবে।

পূর্ব্বকার অনেক লোকেই ধর্ম্মের জন্য বিদ্যালয়, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি দেশহিতকর কার্য্য করিতেন। গভর্ণ-মেণ্টের সাহায্য ভিন্নও অনেক ধনবান্ ব্যক্তির সাহায্যে বিদ্যালয়ের কার্য্য হইত। এক্ষণে সেই প্রকার সাত্ত্বিক দান ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। তবে অধুনা দান-বীর স্বর্গীয় তারকনাথ পালিত মহাশয় ও দাতাকর্ণ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় যে মহৎ আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহা প্রত্যেক ধনবান্ ব্যক্তির অনুকরণযোগ্য। ধনবান্ ব্যক্তিগণ যদি বিলাসিতার ব্যয় কমাইয়া দেশহিতকর ধর্ম্মকার্য্যের সহায্য করেন, তা হইলে আবার দেশে

সৌভাগ্য সূর্য্য উদিত হইয়া অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিবে।

প্রাচ্যকেও পাশ্চাত্য হইতে পাশ্চাত্যের গুণগুলি নিজের করিয়া লইতে হইবে, কিন্তু প্রাচ্য-আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। যে দেশে বেদ, উপনিষদ্, দর্শন প্রভৃতি মহামূল্য গ্রন্থগুলির উৎপত্তি, যে দেশে লীলাবতী, গার্গী, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতির ন্যায় আদর্শমহিলা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সে দেশের আদর্শ অন্য স্থান হইতে লইবার তত প্রয়োজন নাই।

শ্রীগিরিজা-প্রসন্ন সেন,
'গঙ্গাপ্রসাদ নিকেতন,' কুমার টুলী,
কলিকাতা।

চিরকুমারীর ব্রত।

১

প্রশান্ত ধরণী'পর ঢল ঢল শশধর,
অতুলন শোভা কিবা নিখিল ভুবনে,
প্রকৃতি-সুন্দরী হায়! ছড়ায় মাধুরী তায়,
নদী গিরি লোকালয় বন উপবনে।

২

রজত-জোছনাময়ী,রজনী কি শোভাময়ী,
মৃদু মন্দ সমীরণ বিপিনে গাহিছে,
কুসুম ঘরের মেয়ে, উঁকি মেরে দেখে চেয়ে,
চন্দ্রমা সোহাগ-ভরে কারে যে ডাকিছে!

৩

কভু ভাবে ডাকে তারে, উর্দ্ধমুখে চেয়ে তাঁরে,
থাকে যেন ম্লানভরে একাকী বিরলে,
পবন রহস্য ক'রে, তায় যেন তুলে ধরে,
অভিমানে ম্রিয়মাণ হয় সেই কালে।

৪

এ হেন সময়ে হায়! কে গো ঐ ধীরে যায়,
সরলা কামিনী এক কাহার উদ্দেশে,
বিধুমুখী এলোকেশী, ছড়ায়ে লাবণ্যরাশি,
সরসীর তীরে গিয়ে বসে অবশেষে।

৫

চিবুকে কনক-ছটা, আহা কি রূপের ঘটা,
স্বরগের ফুল যেন ফুটেছে কাননে,
সে অধর বিহসিত, প্রাণ মন পুলকিত,
গাইবে প্রেমের গীতি এ হেন বিজনে।

৬

নিশাচর ডাকে দূরে, প্রতিধ্বনি আসে ঘুরে,
নীরব মাধুরী কত প্রকৃতির মাঝে,
বসেছে একান্তে নারী,নাহি কেহ বিঘ্নকারী,
গভীর সে নিশীথিনী সম্মুখে বিরাজে।

৭

অনন্তের ছায়া-প্রায়, কৌমুদীর প্রতিচ্ছায়,
করিছে মধুর গীত অচ্ছোদ-সলিল,

* এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে পাঠক পাঠিকাগণের মতামত এবং যে বিষয়ের সহিত তাঁহাদের মতের মিল না হয় তাহার প্রতিবাদ পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব। শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, এজন্য এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। বা, বো, স।

মধুরে মধুরে কিবা, ফুটেছে অতুল বিভা,
আনন্দেতে ভরপুর এ বিশ্ব নিখিল।

৮

হইয়াছে প্রস্ফুটিত, কুসুমেরা সুবাসিত,
সুগন্ধ ছড়ায়ে দিক করে আমোদিত,
বলয়-শোভিত-কর, যুক্ত রহে নিরন্তর,
বিস্ময়ে পুলকে প্রাণ হয় উচ্ছ্বসিত।

৯

প্রেমে বিকশিত মুখ, নাহি পাপ নাহি দুঃখ,
নিষ্কলঙ্ক মুখখানি সদা ফুটে রয়,
অপূর্ব্ব জ্যোতির মাঝে, নিরুপম রূপ রাজে
কোন শোভা এর কাছে সমতুল নয়!

১০

চন্দ্রমা সে বিধুমুখে, চুম্বিয়া মনের সুখে,
অনিমেষে চায় তার সেই বিম্বাধরে,
বিম্বাধরে উঠে স্বর, 'প্রাণনাথ প্রাণেশ্বর'!
নয়নে স্ফুলিঙ্গ তার সে অমৃত নাদে।

১১

সহসা কুসুমরাণী, শুনিল তাহার বাণী,
মধুর কাতরধ্বনি পশিল হৃদয়ে
কিন্তু রে সামর্থ্য নাই, যাইবার নাহি ঠাঁই,
শূন্য'পরে সমীরণ নাচে তা'রে লয়ে।

১২

দিখিদিক শুভ্রকায়, অনন্তে মিশিয়া যায়,
বিজলি চমকে কিবা প্রেমের পরশে,
জল স্থল নাহি শূন্য, প্রেমে সব পরিপূর্ণ,
জাগিল তাহার প্রাণ নবীন হরষে।

১৩

পবন-অঞ্চল কেলি, প্রভঞ্জন করে কেলি,
সারি সারি বৃক্ষগুলি হয়ে সচেতন,
আজ তারে ভালবেসে, কতই মধুর হেসে,
আপনার জন বলে করে সম্ভাষণ।

১৪

কত মিষ্ট কথা কয়, প্রাণে প্রাণে কি যে লয়,
দেখে প্রেম-সূত্রে বাঁধা নিখিল ভুবন,
ধরে সেই সূত্রটিরে, নামে ধনী ধীরে ধীরে,
চিদানন্দ স্বরূপেতে হইতে মগন।

১৫

প্রাণ মাঝে প্রাণেশ্বর, প্রকাশিয়ে অনন্তর
কতই মধুর প্রীতি করেন বর্ষণ,
পরাণ পাগলপারা, দুনয়নে বহে ধারা,
প্রিয়তম সনে এই মধুর মিলন।

১৬

কণ্ঠে ধ্বনি "প্রাণেশ্বর," রোমাঞ্চিত কলেবর
কুসুম জানিল বর এসেছে তাহার,
চির কুমারীর ব্রত, চিদানন্দ ধ্যানে রত,
হৃদয়ে বিকাশি উঠে আনন্দ অপার।

শ্রীমান সুকান্তি লিখিত দৈনিক লিপি।

১৬ই অগ্রহায়ণ। ১লা ডিসেম্বর।

জগদীশ! আজ প্রাণমন এত চঞ্চল হইল কেন বুঝি না। ঝটিকা-বিস্ফুরিত তরঙ্গরাশির ন্যায় মনে এক অভাবনীয়

চঞ্চলতা আসিয়াছে। তাই আজ তোমার চরণপ্রান্তে শান্তিলাভের জন্য উপস্থিত। দয়াময় এ পাপ পরাণে তোমার করুণা বারি সিঞ্চন কর। হৃদয়ের মলিনতা দূর হউক, চাঞ্চল্য বিদূরিত হউক। তোমার চিন্তনে যেন জ্ঞানালোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হয়। তুমি যে দয়ার সাগর, পতিত-পাবন প্রভু, তোমার কাছে, যে আসে সে তো কখনও শূন্য হৃদয়ে ফেরে না। তোমার শান্ত মধুর ভাব একবার হৃদয়ে ঢুকিতে পারিলে ত আর সংসারে কোন কষ্ট নাই, বিষাদ নাই। তুমি তখন জীবনের চালক হইয়া সুপথে তোমার দিকে চালাইয়া লও। ধন্য সে জীবন, মানব-নামের সার্থকতা ত তাহারই জীবনে। সেই তোমাকে পাইয়াছে। সংসারের প্রলোভনে পড়িয়া মন সর্ব্বদা তোমা হইতে দূরে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাই আমরা এত কষ্ট পাই, জীবনের কর্ত্তব্য ভুলিয়া শান্তির আশে কুপথে আকৃষ্ট হইয়া শেষে অনুতাপ করি। তখন আবার মনে তোমাকে পাইবার জন্য আকুল পিপাসা উপস্থিত হয়। তখন বুঝিতে পারি তুমিই একমাত্র শান্তির প্রস্রবণ। দয়াময়, এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে জ্ঞানের আলোক বিকশিত কর। তোমার মহিমা যেন হৃদয়ে অনুভব করিয়া, তোমার চিন্তায় প্রত্যহ একবার নির্জ্জনে বসিতে পারি। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক প্রভু! ওঁ।

হাজরা লেন, কলিকাতা।

১৩১৯। ১৭ই অগ্রহায়ণ—২-১২-১২।

পরমপিতা পরমেশ, তোমার চরণে কত শান্তি কত সুখ তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যখন মনে হয় আমার পিছনে তোমার ন্যায় অসীমশক্তি কার্য্য করিতেছে, তখন মনে কত আশার সঞ্চার হয়। মনে হয় তবে আমার ভয় কি চিন্তা কি? কিন্তু তোমার অস্তিত্ব ভুলিয়া যাই, পৃথিবীর সাংসারিক প্রলোভনে পড়িয়া হাবুডুবু খাই, তখন আবার তোমার কথা সত্যই মনে উদয় হয়—তখন মনে হয় এবার বুঝি আমায় দয়া করিবে না। এবার বুঝি তুমি ক্ষমা করিবে না। দয়াময়! কিন্তু তোমার স্নেহ, করুণা তখনও হারাই না। কাতর প্রাণে তোমাকে ডাকিলে, হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে তোমার নিকট প্রার্থনা করিলে, তুমি কেমন শান্ত মূর্ত্তিতে আসিয়া ধরা দাও। তোমার করুণা কি অসীম! তোমার দয়ার শেষ নাই প্রভু। তুমি আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার এই অকৃতি সন্তান তোমার নিকট প্রাণ খুলে হৃদয়ের বেদনা জানাইতে পারে ও তোমার মহিমায় হৃদয়ের বেদনা উপলব্ধি করিতে পারে। এই কর প্রভু! যেন তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

১৩১৯। ১৮ই অগ্রহায়ণ। ৩রা ডিসেম্বর। ১২।

দয়াময়, আজ যে আবার পথভ্রষ্ট হ'য়ে তোমা হইতে অনেক দূরে এসে পড়েছি, কর্ত্তব্য ভুলে গিয়ে অলস ভাবে দিনপাত করিতেছি। তুমি যে অমূল্যধন সঙ্গে দিয়াছিলে তাও হারায়ে ফেলিছি। প্রভু!

চারিদিক যেন শূন্য বোধ হইতেছে। তাও তোমার করুণাকণা! হৃদয়ে আবার আশাবহ্নি প্রজ্বলিত কর। এ শুষ্ক প্রাণে এক বিন্দু প্রেমবারি সিঞ্চন কর। জ্ঞান পিপাসা হৃদয়ে জাগাইয়া দাও প্রভু! আশীর্ব্বাদ কর যেন এবার হ'তে আর তোমার নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে বিচ্যুত না হই। পাগলের মত ঘুরিয়া ফিরিয়া এবার তোমার দ্বারে উপস্থিত প্রভু! কেবল ধাক্কা খাইলাম লাঞ্ছিত হইলাম, আর কেহ ত প্রাণের আশা মিটাইতে পারিল না. ভাল মুখে একটা কথা কহিল না। তোমার ন্যায় পাপীর বন্ধু আর কে আছে? শূন্য হৃদয়ে পৃথিবীর এক কোণে পড়িয়াছিলাম। সংসারের দুঃখ কষ্ট দেখে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম। নিজের অস্তিত্ব ভুলে গিয়া ষড়রিপুর বশ হইয়াছিলাম। কখনও ভাবিতাম এই বুঝি শান্তি পাইলাম, আবার ধাক্কা খাইয়া মোহ ভাঙ্গিত। যে যখন যে দিকে চালাইত, সেই দিকেই যাইতাম। হায়! আমি কি মুর্খ, আমি কি অধম, তোমার কথা একবারও মনে পড়ে নাই। কি মোহে আমার হৃদয় আচ্ছন্ন ছিল যে তোমার আহ্বানও কর্ণে প্রবেশ করে নাই। এবার তোমায় চিনিয়াছি প্রভু! তুমি যে দয়াময়, পাপীর সম্বল তাহা বেশ বুঝিয়াছি। যদি দয়া করিয়া সুমতি দিয়াছ তবে মাঝে মাঝে লুকায়ে থাক কেন, প্রভু! আমার হৃদয় যে বড় দুর্ব্বল। তোমাকে না দেখিলেই আবার ছয় জনায় মিলে আমায় কুপথে টানিবে। তুমি প্রহরীর মত থাকিয়া আমায় রক্ষা কর প্রভু!

২১শে অগ্রহায়ণ। ৬ই ডিসেম্বর। ১২

পরম পিতা পরমেশ, তোমার এ অধম সন্তানে কি কৃপা করিবে না প্রভু! তোমার করুণায় বাঁচিয়া আছি সত্য, কিন্তু তোমায় বুঝিতে পারি কই? মৎস্য যেমন জলে থাকে, জল ভিন্ন বাঁচিতে পারে না, আমরাও তেমনি তোমার ভিতরে রহিয়াছি, তোমা ভিন্ন আমরাও নিশ্চল নিষ্পন্দ হই। কিন্তু প্রভু! সেই জীবনের জীবনকে বুঝিতে পারিব না, একি কম আক্ষেপের কথা। তুমি আমাকে রক্ষা করিতেছ, আর আমি তোমার কথা ভুলিয়া আছি! দয়াময়, আর কতকাল লুকায়ে থাকিয়া কষ্ট দিবে? তোমায় পাইবার জন্য মানবের মনে যে আকুল আকাঙ্ক্ষা দিয়াছ, মানবকে বুঝিতে দিয়াছ যে তুমিই তাহার প্রাণ; তবে সে আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখ কেন প্রভু! জগতের পিতা তুমি, তোমার রাজ্যের কেমন শৃঙ্খলতা, সেখানে কেমন শান্তি বিরাজ করিতেছে। মানবকে স্বাধীনতা দিয়ে পাঠাইয়াছ সত্য, কিন্তু তোমার সাহায্য ব্যতীত কাহারও একপাও নড়িবার যো নাই। তোমাকে না বুঝিলে সংসার মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক, নীরস বলিয়া বোধ হয়। তোমাকে না বুঝিলে সংসারের সুখ কি তাহা বুঝা যায় না, মানবজীবনের কর্ত্তব্য স্থির করা যায় না। তবে কেন প্রভু!

লুকায়ে থাক? তোমার মহিমা সীমাবদ্ধ মানবহৃদয়ে প্রকাশিত কর প্রভু। তুমি অসীম বলিয়া ক্ষুদ্র মানব তোমাকে কি ধারণা করিতে পারিবে না? নিশ্চয়ই পারিবে। তুমি ত দয়াল, দয়াসাগর, অসীম-শক্তি-সম্পন্ন। তুমি মানবের নিকট শান্ত, সরল ভাবে ধরা দাও, হৃদয়ে তোমার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে ক্ষমতা দাও। ন্যায় অন্যায় বুঝিতে দাও। সংসারে তুমিই আমাদের ধ্রুবতারা ও তুমিই আমাদের চালক। তোমাকে বুঝিতে না পারিয়াই ত বিপথে চলিয়াছিলাম। অমনি মৃত্যু এসে তোমার প্রদত্ত সে অমূল্য ধন কাড়িয়া লইয়াছে। তাই ত পথহারা হ'য়ে তোমায় খুঁজিতেছি। অকৃতী সন্তানকে দেখা দাও প্রভু! তোমার প্রতি অটল বিশ্বাস দাও, মুহূর্ত্তের জন্যও যেন অবিশ্বাস প্রাণে আসে না। তুমি অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, তোমার প্রতি যেন অবিশ্বাস আসে না। পৃথিবীতে যখনই যে দিকে তাকাই, তখনই তোমার অসীম শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়া স্তম্ভিত হই। প্রভাতের বালসূর্য্যের কিরণ-চ্ছটায়, অমানিশার নক্ষত্রের ভিতর, পূর্ণিমার স্নিগ্ধ শুভ্র জ্যোৎস্নায় তোমারই মহিমার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতেছি। তোমাকে অবিশ্বাস করিবার ত কোন কারণ নাই। তবে কেন মাঝে মাঝে তোমায় ভুলে যাই? কেন তোমার মহিমায় বিশ্বাস হয় না? দয়াময়, সে দিন টাইটানিক-নামক জাহাজ তোমার ইঙ্গিতে মুহূর্ত্তমধ্যে জলমগ্ন হইল। মানবের ক্ষমতা যে তোমার নিকট বিন্দু হইতে বিন্দু; তাহাই তুমি প্রমাণ করিলে। মানবের শক্তি কি ক্ষুদ্র! তোমাকে বিশ্বাস করিতেই হইবে। তোমার আদেশে, বিশাল ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে, তবে আমায় চালাও না কেন প্রভু? আমি ত যেমন তেমনই রহিয়াছি? এক পদও জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হইতে পারি নাই। প্রতিপদে কত বাধা, কত কষ্ট! তোমার সাহায্য ভিন্ন কেমন করে এ দুস্তর সাগর পার হইব প্রভু? দাও, দয়াময়, তোমাতে অটল বিশ্বাস। তোমার কর্তৃত্বে যেন সর্ব্বদা থাকিতে পারি। হৃদয়ে আশা ও বল দাও, কর্ত্তব্যবুদ্ধি দাও। নৈরাশ্য আসিয়া মাঝে মাঝে কর্ত্তব্যচ্যুত করে না যেন। তোমার শক্তির কথা মনে রাখিয়া তোমাকে স্মরণ করিয়া যেন প্রত্যেক কার্য্যে রত হইতে পারি। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

১৩১৯। ২২শে অগ্রহায়ণ। ৭ই
ডিসেম্বর। ১২।

জগৎপিতা জগদীশ, মানবকে তুমি জগতের শ্রেষ্ঠ জীব করিলে; বিবেক, বুদ্ধি, মন দিয়া গঠন করিলে; তবুও মানব তোমায় বুঝিতে পারে না কেন প্রভু? প্রত্যেক মানবকে এক একটী মনোরাজ্য দিয়াছ; শাসন করিবার জন্য বিবেক দিয়াছ, বুদ্ধি দিয়াছ। কিন্তু আমরা রাজ্য পালন না করিয়া দুষ্ট প্রজা কুপ্রবৃত্তির দাস হইয়া পড়িয়াছি, তোমাকে যে আমাদের রাজা বলিয়া আর মানিতে চাই

নাই! এখন তোমার সাহায্য ভিন্ন ত আর এ প্রকৃতিকে দমন করিতে পারিতেছি না। তুমি বল দাও, শক্তি দাও। তুমি হাতে ধরে টেনে উঠাও প্রভু। তুমি কেমন সুন্দর করে সাজিয়ে পৃথিবীতে সুধা কিনিবার জন্য পাঠাইয়াছিলে, সঙ্গে কত প্রহরী দিয়াছিলে, অমূল্য ধন দিয়াছিলে, আমি অবিবেক বশতঃ সব হারাইয়া বসিলাম। জ্ঞান পাইয়া জ্ঞান হারাইলাম। তোমার আলো পাইয়াও আবার অন্ধকারে ডুবিলাম। যে তোমার আদেশ পালন করিয়া চলিয়াছে, তাহার নিকট পৃথিবী কেমন সুন্দর,কেমন শান্তির স্থান। তুমি মানবকে যে অসীম শক্তি দিয়া পাঠাইয়াছ, তাহা হৃদয়ে অনুভব করিতে দাও। বিবেক-বুদ্ধির বলে মানব কি অসাধ্য সাধন করিতে পারে! তুমি যাহার অভিভাবক, তাহার ত কিছুই অসাধ্য নাই। তোমার শক্তির যে এক বিন্দু হৃদয়ে দিয়াছ, তাহারই প্রভাবে মানব আজ শূন্যমার্গে বিচরণ করিতে সক্ষম। তুমি যেমন মানব-হৃদয়ে অতৃপ্ত বাসনা দিয়াছ,তেমনি সে সব পূর্ণ করিবার শক্তিও ত দিয়াছ। কি মোহে আচ্ছন্ন হইয়াছি যে, সে শক্তি হৃদয়ে অনুভব করি না। দয়াময়, তুমি হৃদয়ে সেই শক্তির বিকাশ কর, যেন তাহার প্রভাবে মানবজীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি। তবেই ত প্রভু, তোমায় ভাল করিয়া চিনিতে পারিব। কতকাল আর ঘুমঘোরে অচেতন থাকিব। দয়া কর প্রভু, এ জীবনে আবার ধর্ম্মস্রোত প্রবাহিত কর। হৃদয়ের কালিমা দূর হউক। সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় যেন হুঙ্কার ছাড়িয়া তোমার আদেশ পালনে রত হই। সত্যকে আশ্রয় করিয়া তোমার করুণায় যেন কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে পারি এই কর প্রভু, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

৺ সুকান্তির মৃত্যু উপলক্ষে।

সুকান্তি আমার পরম আত্মীয়। ইহাঁর অভাবে আমরা নিতান্ত সহায়হীন ও কাতর হইয়া পড়িয়াছি। ইহাঁর পিতা-মাতার কথাও লিখিয়া জনসমাজে প্রকাশ করা অসাধ্য।

ইহাঁর পিতার নাম শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র সেন। ইহাঁর পিতা সুশীল, সুবোধ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি। কিন্তু সুকান্তির ন্যায় উৎসাহশীল, উদার, সরল ও ধার্ম্মিক পুত্রের অকাল মৃত্যু তাঁহাকে একেবারে দিশাহারা করিয়া ফেলিয়াছে।

সুকান্তি শ্রীমতী রাখালদাসীনাম্নী একটি নিষ্ঠাবতী রমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। শ্রীমতী রাখালদাসী পুত্রের অভাবে অনাহার-ব্রত গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা হরিনাম কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়া-

ছেন। সমস্ত রজনীর মধ্যেও তিনি নিদ্রা যান না, কেবল মধুর স্বরে হরিনাম গান করিয়া থাকেন।

পিতামাতার উপযুক্ত পুত্র ৺সুকান্তির ঈশ্বরে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ না করিয়া তিনি কোনও কাজেই হস্তক্ষেপ করিতেন না। তাঁহার নিজ-হস্ত-লিখিত দৈনিক ডায়েরীতে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

১২৯৯ সনের ২২শে আষাঢ় মঙ্গলবার ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৩২০ সালের ৩০শে অগ্রহায়ণ রবিবারে কালীঘাটে ৬নং নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্যের লেনে বেলা ৪টার সময় সান্নিপাতিক জ্বরে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তিনি St. Xavier College এ B. Sc. (fourth year) পড়িতেন। একদিন Test পরীক্ষা দিয়া জ্বরাক্রান্ত হইয়াছিলেন।

ইহঁার অভাবে পৃথিবী একটি সুসন্তান হারাইয়াছেন। এমন মিষ্টভাষী, পরোপকারী, উৎসাহশীল ও ধর্ম্মভীরু সন্তানের অভাবে দেশও মহাক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা।

কবিতার প্রাণ।

কবিতা কি প্রাণশূন্য! সত্য বটে, আজকালিকার অনেক কবিতার ভাবা আছে, ছন্দ আছে, উপমার ঘটা আছে ও অনুপ্রাসেরও ছটা আছে, কিন্তু নাই কেবল ভাব, নাই কেবল প্রাণ! তাই সেগুলিকে কবিতা না বলিয়া অন্য কিছু বলিলে, বোধ করি ক্ষতি, হয় না। কিন্তু শুনিয়াছি যে, কয়েকটী কবিতা ও একখানি উপন্যাস আমেরিকায় প্রচলিত জঘন্য দাস বিক্রয়-ব্যবসায়ের মূলোচ্ছেদ করিয়াছিল। যদি এই উক্তির ঐতিহাসিকতা ও সারবত্তা মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে অস্বীকার করা যায় না যে, কবিতার প্রাণ আছে। বস্তুতঃ বিবিধ ছন্দোবদ্ধ সুললিত শব্দপিণ্ডময় কবিতাগুলির শব্দালঙ্কারের ঘটা ও উপমার ছটা থাকিলেও তাহাদিগকে "কবিতা" এই আখ্যা প্রদান করিলে প্রকৃত কবিতার অবমাননা করা হয়। যে কবিতার ভাব আছে, ভাবের পরিস্ফুটনা আছে, এমন কি যে কবিতায় ভাব ও ভাষা ওতঃপ্রোত ভাবে অবস্থিত অর্থাৎ যে কবিতার ভাবা ও ছন্দ তাহার প্রত্যেক ভাবকে সুক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ভাবে স্ফুটতর করিয়া তুলিতেছে, সে কবিতা যে প্রাণহীন তাহা কেমন করিয়া বলি! কাউপারের "Jhon Gilpin" কবিতাটী কোনও নিপুণ আবৃত্তিকারক দ্বারা কোন সভাস্থলে আবৃত্তি করা হইলে সভাকক্ষটি সুবিমল হাস্যধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠে! কোলরিজের "Ancient Mariner" পাঠ

করিলে হৃদয় যুগপৎ ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়। Shelleyর "Skylark" কবিতাটী পাঠ করিলে হৃদয় যেন উদাস হইয়া কোন এক দূর দূরতর স্বপ্নরাজ্যে উড়িয়া যায়! Campbell এর "Ye Mariners of England" কবিতাটী হৃদয়দেশ স্বজাতি-গৌরবে ও স্বদেশপ্রেমে পরিপূর্ণ করিয়া তুলে। নবীন বাবুর শান্তিরসাত্মক কবিতাগুলি অবসাদপূর্ণ ও দুঃখক্লিষ্ট প্রাণে যখন আমরা পুনঃ পুনঃ পাঠ করি, তখন আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল শান্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠে! অমরকবি মধুসূদনের অমরকাব্য "মেঘনাদ বধে" প্রমীলার চিতাধিরোহণ-সময়ে শোকাকুল রাবণের বিলাপোক্তি মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়া অজ্ঞাতসারে নেত্রযুগল অশ্রু-ভারাক্রান্ত করিয়া তুলে!

ঐ সকল ভাবপ্রাণ কবিতার যখন একটা ক্রিয়া (action) আছে, উহারা যখন ইচ্ছা করিলেই ক্ষণকালের মধ্যে আমাদের প্রসুপ্ত ভাবতন্ত্রীগুলিকে কোন এক অদৃশ্য অঙ্গুলির স্পর্শে জাগাইয়া দিতে পারে, তখন আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ কবিতাগুলি প্রাণময়ী ও সজীব। কবি যে কোন ভাব লইয়াই আলোচনা করুন না কেন, তাঁহার কবিতায় সেই ভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি থাকা আবশ্যক।

যখন শব্দমাত্রেই কোন একটী ভাবের সংবাহক ও প্রতিমূর্ত্তি এবং সেই শব্দগুলি যখন প্রত্যেক কবিতায় বাক্যাকারে গ্রথিত, তখন সকল কবিতাই যে ভাবময়, এমন প্রশ্নও কেহ কেহ তুলিতে পারেন। কথাটা তাহা হইলে একটু সবিস্তারে বুঝা আবশ্যক। ফুলরাশি মালা নহে, ফুলগুলি সূত্রবদ্ধ করিয়া মালার মত করিয়া গাঁথিলেই তাহা ফুলমালা হয়। শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রী মহাশয় একবার এক বক্তৃতায় যথার্থই বলিয়াছিলেন যে, কতকগুলি বেল ফুলের সহিত যদি কতকগুলি জুঁই ফুল মিশাইয়া মালা গাঁথা হয়, এবং লোককে বলা হয় যে, উহা কেবল বেল ফুলের মালা, তাহা হইলে লোকে বিশ্বাস করিবে কেন? পুনশ্চ বর-সজ্জার (ফুলশয্যার) নিমিত্ত ফুলের মালা আবশ্যক, যদি তৎপরিবর্ত্তে বরের গলে পুঁতির মালা পরাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে কি প্রথামত কার্য্য করা হইবে? যেমনই শ্রুতিকটুই হউক, আর সুললিতই হউক, শব্দের সমষ্টি বা যোজনা মাত্রই বাক্য নহে। বাক্যরচনার একটা নিয়ম বা প্রণালী আছে। অপিচ সময়ে সময়ে রচয়িতার অক্ষমতা-নিবন্ধন কবিতায় হয়ত এমন পরস্পর-বিরুদ্ধাত্মক ভাব প্রকাশ ও ভাষার ব্যবহার করা হয় যে, তাহাদের যৌগিক সম্মিলনে বস্তুতঃ কোনও মৌলিক রসেরই উদ্দীপনা হয় না! ভাব ও ভাষার সুন্দররূপে একত্র সমাবেশ না থাকিলে কবিতামালা গ্রথিত হইতে পারে না। কবি যে ভাবের অভিব্যক্তি করিতে চাহেন, যদি হৃদয়স্পর্শী ভাষার প্রভাবে তাঁহার কবিতায় স্বতঃই সেই ভাবের পূর্ণপ্রকাশ

পরিলক্ষিত হয়, তবেই বলিতে হইবে যে, তাঁহার কবিতায় জীবনী শক্তি আছে, তাহা প্রাণময়ী। পরন্তু বিরুদ্ধভাবাত্মক ভাষা বা ভঙ্গির ব্যবহার শূন্য হইয়াও কোনও কবিতায় যদি অভিপ্রেত ভাবের স্পষ্ট অভিব্যক্তি না থাকে, তবে তাহা প্রাণহীন।

শ্রীদীনেশচন্দ্র দাস।

ভূত না মানুষ।

আমি ব্যাকুল হইয়াছি আমার কন্যার জন্য। একবার সে তাহাদের হস্তে প্রাণত্যাগ করিতে বসিয়াছিল, এবার দেখিতেছি সত্য সত্যই সে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

নন্দক কহিলেন "মা, তুমি আমার ভগিনীর জন্য কিছুমাত্র ব্যাকুল হইও না। যে তাহাকে লইয়া গিয়াছে, সে কখনও তাহার অনিষ্ট সাধন করিবে না, কারণ সে তাহাকে ভালবাসে। তোমাদের বিশ্বাস যে, সে একবার তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু আমার বিশ্বাস, সে তাহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিত বলিয়া সবল হস্তে মারিতে পারে নাই। সেই জন্যই তুমি তাহাকে বাঁচাইতে পারিয়াছিলে। এখনও সে তাহাকে মারিতে পারিবে না, বরং আদরের সহিত পালন করিবে। চল, এখন আমরা তাহাদের উদ্দেশে বহির্গত হই। দেবদত্ত কেমন আছেন?" নন্দকের মাতা নন্দকের কথায় অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়াছিলেন, অতএব রুক্ষস্বরে উত্তর করিলেন, "তুমি রাজপুতানাভিমুখে বহির্গত হইয়া চলিয়া গেলে, আমার অনুমত্যানুসারে সে তোমার অনুসরণ করিয়াছিল। তোমার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ফিরিয়া আসিবার কথাও ছিল, কিন্তু তাহাকে না দেখিয়া আমি চিন্তিত হইতেছি—সেও কি তবে শত্রু-হস্তে নিপতিত হইল?"

"অসম্ভব কি! চল এখন চল, আর বিলম্বে দরকার নাই" এই বলিয়া নন্দক বিশ্বস্ত ভৃত্যদিগকে সতর্ক ভাবে বাটী রক্ষা করিতে কহিয়া নিজে মাতার সহিত বহির্গত হইলেন। তখন রজনী প্রভাত হইয়া গিয়াছে। নন্দকের আগমনের পর এই ২০ মিনিট অতীত হইল। তথায় তাহারা উক্ত কুসুমিত বনের মধ্য দিয়াই রওনা হইল। এই বনের মধ্যে পাঠক-পাঠিকার সঙ্গে একবার দেবদত্তের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে যাহাউক, দেবদত্তের ভাগ্য নন্দককে সেই পথ দিয়াই টানিয়া লইয়া চলিল। নন্দক জননীকে আপন পৃষ্ঠ-দেশে উপবেশন করাইয়া বিদ্যুদ্বেগে সাত্যকীকে ছুটাইয়া দিলেন। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই বহু লোকের ও অশ্বের পদচিহ্ন তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। ইহাতে তিনি ও তাঁহার মাতা অত্যন্ত পুলকিত ও

পুলকিতা হইলেন। ঘোড়া নিয়মিতরূপে ছুটিয়া চলিতে লাগিল। অশ্ব ও অশ্বারোহীর বিরাম বিশ্রাম রহিল না। যে স্থানে গিয়া দেবদত্ত বিশ্রাম লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও যথাকালে গিয়া সেই খানে উপস্থিত হইলেন এবং সেই স্থলে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া কিঞ্চিৎকাল চিন্তামগ্ন রহিলেন। দেখিলেন, সেটা মানুষের বিশ্রামের উপযুক্ত স্থানই বটে। তিনি সেইখানে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সুদূরে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। তাঁহার মনে সন্দেহের উদয় হইল। তিনি সাত্যকীকে একখানি কাল বর্ণের প্রস্তরের পার্শ্বে মৃতবৎ পড়িয়া থাকিতে ইঙ্গিত করিয়া মাতার সঙ্গে বনপথে প্রবেশপূর্ব্বক হাঁমাগুড়ি দিয়া সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে নন্দক বিজ্ঞতা সহকারে বুঝিতে পারিলেন যে,অনেকতক লোক দেবদত্তকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। তখন তাহারা পূর্ব্ববৎ হাঁমাগুড়ি দিতে দিতেই যথাসম্ভব শীঘ্র করিয়া গিয়া আপনাদের অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং প্রায় শত হস্ত দূরে থাকিয়া যথাসম্ভব সতর্ক হইয়া তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে সেই সব মনুষ্য বাহকেরা দেবদত্তকে একখানি নৌকাতে আরোহণ করাইল এবং নৌকা নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে লইয়া যতদূর সম্ভব দ্রুতবেগে নৌকা চালাইয়া দিল। নন্দকও বনের মধ্য দিয়া নৌকার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া চলিলেন। তিন ঘণ্টা কাল ছুটা ছুটীর পর নৌকা তীরবর্ত্তী হইল। নৌকার ভিতরেই শিবিকা ছিল। নৌকা চালকেরা শিবিকা-বাহক হইয়া দেবদত্তকে লইয়া ছুটিয়া চলিল। নন্দক সাত্যকীকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে ইঙ্গিত করিয়া নিজেরা যথাসম্ভব দ্রুতবেগে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। নন্দক ও নন্দকের মাতা অন্ধকারে লতা-পত্রের মধ্যে এরূপ প্রচ্ছন্নভাবে চলিতেছিলেন যে, বিপক্ষেরা পশ্চাৎ দিকে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিয়াও তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছিলেন না। শিবিকার বাহকস্বরূপ আট জন লোক ছিল। আরও দুইজন লোক শিবিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছিল। হঠাৎ তাহাদের মধ্যে একজন, পরক্ষণেই অপর জন, নন্দকের বজ্রসম মুষ্ট্যাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। নন্দক যথাসম্ভব ক্ষিপ্রহস্তে লতা-পল্লব দ্বারা তাহাদিগকে বন্ধন করিয়া রাখিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শিবিকার দুই দিকে ডাণ্ডা থাকে। বাহকেরা ঐ ডাণ্ডা স্কন্ধে করিয়া শিবিকা বহন করিয়া লইয়া যায়। নন্দক একজন বাহকের পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক এমনি সজোরে আকর্ষণ করিলেন যে, সে ভূমিতলে পড়িয়া জ্ঞানহীন হইল। তাহার মৃদু পতন শব্দ কাহারও কর্ণগোচর হইল না। তারপর তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তিকেও ঐ দশা প্রাপ্ত করাইলেন। তখন বিপক্ষদের

চৈতন্যোদয় হইল। অন্ধকারে কোন দিকে দৃষ্টি চলে না। তথাপি তাহারা বুঝিতে পারিল যে, শত্রু তাঁহাদের পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়াছে। তাহারা চারিজন লোক হারাইয়াছে, কারণ তাহারা তাহাদের কোন সাড়া শব্দই পাইতেছিল না। নন্দক তখন আপনার গুপ্ত লণ্ঠন প্রজ্বলিত করিয়া আপনার মুখের নিকট ধারণ করিলেন। তৎকালে বাহকেরা শিবিকা ভূমিতলে না নামাইলেও চলিতেছিল না, স্তব্ধভাবে এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দ্দিক দেখিতেছিল। নন্দক তখন তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া চীৎকার করিয়া কহিলেন, 'তোমাদের মধ্যে যদি কেহ আমার পরিচিত থাক, তবে দেখ আমি কে। মিথ্যা কথা নহে, ভাল করিয়া দেখ—আমি নন্দক, যাহার তরবারীর আঘাতে প্রচণ্ড পর্ব্বতও খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। এই বলিয়া নন্দক, লণ্ঠন জননীর হস্তে প্রদানপূর্ব্বক, শত্রুদগুলীকে লক্ষ্য করিয়া দক্ষিণ হস্তে পিস্তল ধারণপূর্ব্বক বামহস্তে তরবারী সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। বাহকদের মধ্যে দুইজন ছিল। তাহারা শিবিকা ভূমিতলে রাখিয়া নন্দককে আক্রমণ করিতে আসিল, কিন্তু কেহ তরবারীর আঘাতে হত হইল, কেহ বন্দুকের আঘাতে ভীষণরূপে আহত হইল, কেহ পলাইয়া গেল, তখন নন্দক শিবিকা হইতে দেবদত্তকে বাহির করিয়া জননীর সাহায্যে বহন করিয়া লইয়া চলিলেন। তাঁহারা একটি নিরাপদ স্থান খুঁজিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে রজনী প্রভাত হইয়া গেল, তিনি বনপথ ত্যাগ করিয়া একটি খোলা মাঠে আসিলেন এবং দেবদত্তকে ভূমিতলে শয়ন করাইয়া তাহার মস্তক আপন কোলে ধারণ করিয়া রহিলেন। তাহার মাতা দেবদত্তের এই দশা অবলোকনপূর্ব্বক শোকে একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং পুরুষবেশ দূরে নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় সেই বাৎসল্যময়ী রমণীর বেশ পরিধানপূর্ব্বক দেবদত্তের নিকট উপবেশন করিয়া তাহার চোকে,মুখে ফুৎকার দিতে লাগিলেন এবং নানারূপ গাছ গাছড়া হস্তে পেষণ করিয়া কখনও দেবদত্তের নাসিকারন্ধ্রে, কখনও ব্রহ্মরন্ধ্রে, কখনও নাভিদেশে, কখনও পদতলে, লেপন করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে দেবদত্তের চৈতন্যের সঞ্চার হইল। তিনি চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন নন্দক তাহার মস্তক ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক স্থির ভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, আর নন্দকের মাতা তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক তাহার পরিচর্য্যায় রত রহিয়াছেন। দেবদত্তকে চক্ষু উন্মিলন করিতে দেখিয়া নন্দক ও নন্দকের মাতা যুগবৎ আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। (ক্রমশঃ)

অম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্তা।

৺ গোপালকৃষ্ণ গোখেল।

ভারতমাতার সুসন্তান, দেশগৌরব, কর্ম্মবীর গোপালকৃষ্ণ গোখেল ৭ই ফাল্গুন রাত্রি সাড়ে দশ ঘটিকার সময় ৪৯ বৎসর মাত্র বয়সে দুইটী অবিবাহিতা শিক্ষিতা কন্যা রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই দেশহিতব্রত মহাত্মার তিরোভাবে সমগ্র দেশবাসী শোকাকুল হইয়াছেন। গোখেলের অকাল মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইল, ভারতের সে ক্ষতি কতকালে পূর্ণ হইবে তাহা জানি না।

প্রায় কুড়ি বৎসর ধরিয়া এই কর্ম্মবীর মহারাষ্ট্রতনয়ের খ্যাতি সমস্ত ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। মহাত্মা গোপালকৃষ্ণ গোখেল ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র দেশের কোলহাপুর নগরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্পবয়সেই পিতৃমাতৃহীন হইয়া অতি কষ্টে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া বি, এ, উপাধি লাভ করেন। ১৮ বৎসর বয়সে পুনা নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলে শিক্ষকরূপে প্রবেশ করেন। এই স্কুলটী তিলক প্রভৃতি কয়েকজন মহারাষ্ট্র-দেশ-সেবক ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে স্থাপন করেন। এই স্কুল বর্ত্তমান সময়ে ফারগুসন কলেজে পরিণত হইয়াছে। গোখেল মাসিক ৭০ টাকা বেতনে এই স্কুলে অর্থশাস্ত্র ও ইতিহাস শিক্ষা দিবার ভার গ্রহণ করেন। কলেজে শিক্ষকতা করিয়া যে কিছু সময় পাইতেন, তাহা অর্থশাস্ত্রবিষয়ক পুস্তক সমস্ত অধ্যয়নে অতিবাহিত করিতেন। দেশের আর্থিক অবস্থা বিষয়ে তাঁহার গভীর জ্ঞানের বীজ এই স্থানেই রোপিত হয়। এই সময় মহামতি গোবিন্দ রাণাডের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি রীতিমত রাজনীতি চর্চ্চা আরম্ভ করিলেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি জাতীয় মহাসমিতির পুণা অধিবেশনের সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় আয় ব্যয় সম্বন্ধে মীমাংসা করিবার জন্য ‘ওয়েরলি’ কমিশন স্থাপিত হয়। এই কমিশনের সমক্ষে সাক্ষী দিবার জন্য মিঃ ওয়াচার সহিত গোখেল বিলাত গমন করেন। এই কমিশনের সমক্ষে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশিত হইলে, সকলেই তাঁহার সারগর্ভ-যুক্তি ও দেশের আর্থিক অবস্থার যথাযথ বিবরণ পাইয়া মুগ্ধ হইলেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হয়েন। সুতরাং ১৯০২ খৃঃ অব্দে ১৮ বৎসর ফারগুসন কলেজে কার্য্য করিয়া ৪০৲ টাকা মাত্র পেন্সন পাইয়া কার্য্য ত্যাগ করেন। এই সময় হইতে গোখেলের প্রকৃত দেশ-সেবা আরম্ভ হইল।

গোখেল সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া অনেক মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। দক্ষিণ-আফ্রিকাস্থ ভারতীয় শ্রমজীবীদিগের দুঃখ-ক্লেশ অবসানের জন্য ভারত-

গবর্ণমেণ্ট ও দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইয়া বুয়ার গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিকার-প্রার্থী ও তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে সফলকাম হয়েন। গোখেলের শেষ কীর্ত্তি—সমগ্র ভারতে বাধ্যতামূলক-শিক্ষা-প্রচারের চেষ্টা। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি Public Service Commission-এর সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই কমিসনের ফলে যাহাতে ভারতবাসী গভর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্ম্মে প্রবেশ লাভ করিতে পারে, তাহার জন্য পরিশ্রম করিতেছিলেন, কিন্তু সে পরিশ্রম শেষ হইতে না হইতেই তিনি অকালে চির-বিদায় গ্রহণ করিলেন। ভগবান্ তাঁহার আত্মার অনন্ত উন্নতি ও শান্তি বিধান করুন।

মার্কিণ ও বঙ্গ মহিলা।

বঙ্গদেশের নারীদের ন্যায় মার্কিণ-দেশীয় নারীগণের মধ্যে সরলতা, পবিত্রতা, ঈশ্বরপরায়ণতা প্রভৃতি কতকগুলি বিশিষ্ট গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে, স্ত্রীস্বাধীনতার মহাক্ষেত্রে, আজীবন-মুক্ত মার্কিণ-মহিলাগণ বঙ্গরমণীর ন্যায় নারীর বিশিষ্ট ধর্ম্ম পালন করিতে সক্ষম হন, ইহা প্রকৃতই আশ্চর্য্যের বিষয়। সে দেশের বিদ্যাশিক্ষা, সামাজিক নিয়ম এবং উন্নত ভাব যে ইহার অন্যতম কারণ তাহা অস্বীকার করা যায় না। বঙ্গ ও মার্কিণ মহিলাদের মধ্যে যে প্রকৃতিগত ও দেশাচারগত বিভিন্নতা আছে তাহাও স্বীকার করা যায়। তথাপি এই সকল বিভিন্নতার মধ্যে যে সমতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নারীগণের বশিষ্ট গুণ, এবং তাহা চিরদিনই সমগ্র জগতে অনন্ত ভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে। নারীর ধর্ম্ম যে সকল-দেশীয় নারীগণ পালন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা বঙ্গদেশীয় ও মার্কিণ-দেশীয় রমণীগণের বিভিন্নতা ও সমতা প্রদর্শন করিব ও কি উপায়ে উভয়ে উভয়ের সমকক্ষ হইতে পারেন, তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

শিক্ষা।

শিক্ষা সাধারণ অর্থে অনেক প্রকার। ইহার মধ্যে বিদ্যা-শিক্ষা, সামাজিক-শিক্ষা ধর্ম্ম-শিক্ষা, স্বাস্থ্যসংরক্ষণ-শিক্ষা প্রভৃতি অনেক বিষয় রহিয়াছে। প্রথমতঃ আমরা বিদ্যাশিক্ষার বিষয় আলোচনা করিব। মার্কিণদেশে প্রত্যেক পিতা-মাতা কন্যাকে সুশিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত। কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে মার্কিণদেশীয় পিতা-মাতা সেই কন্যাকে কি ভাবে প্রতিপালন করিবেন, কি শিক্ষা দিবেন, কি ভাব পোষণ করিতে দিবেন, তাহার

একটী নক্সা করিয়া লন এবং কন্যার বয়োবৃদ্ধি-সহকারে তাঁহাদের কল্পিত চিত্র বা আদর্শ তাহার সম্মুখে রাখেন ও তাহাকে সেই আদর্শানুযায়ী চলিতে হয়। অবশ্য এই আদর্শ অঙ্কিত করিবার পূর্ব্বে পিতা-মাতার মধ্যে অনেক আলোচনা হয় ও অনেক সময়ে এই আদর্শের কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তিত করিতে হয়। যখন পিতা-মাতা উপলব্ধি করেন যে, কন্যার কোন বিশিষ্ট ভাবের সহিত আদর্শের সমন্বয় হইতেছে না,তখনই এইরূপ করিতে হয়। জ্ঞান-বিকাশের সহিত কন্যাকে এই আদর্শ মানিয়া চলিতে হয় ও ভবিষ্যতে তিনি একজন আদর্শস্থানীয়া হইতে সক্ষম হন। অনেকে এই ভাবের পোষকতা করিতে অক্ষম হইবেন, কারণ তাঁহারা ভাবিবেন যে, ইহাতে কন্যার বাল্যকাল হইতে স্বাধীনভাবে কার্য্যকরণের প্রশ্রয় না দিয়া তাহা খর্ব্ব করা হয়,কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। এই আদর্শ চিত্রে উহার সম্পূর্ণভাবে পোষকতা করা হইয়াছে। অধিকন্তু উহা সুশিক্ষিত পিতামাতার বুদ্ধি জ্ঞানের দ্বারা সংযত হইয়াছে, কারণ এরূপ না হইলে পরে স্বেচ্ছাচারিতা আনীত হয়। মার্কিণদেশের পিতা-মাতারা যে কেবল এই পন্থাবলম্বী তাহা নহে, এমন কি সেই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও ঐ ভাবকে উৎসাহ দিয়া থাকে ও তাহাদের শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধীয় নিয়মাবলিও তাহার পোষকতা করিয়া থাকে। যে শিক্ষা কেবল কতকগুলি জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠ করিতে দেয় ও সম্যক উপলব্ধি করিয়া জীবনের দৈনিক কার্য্যে নিয়োজিত করিতে সাহায্য না করে, তাহা প্রকৃত শিক্ষা নহে। মার্কিণ-দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দুইটী বিশেষত্ব আছে, যথা—Co-educational অর্থাৎ যাহাতে পুরুষ ও নারী একত্রে শিক্ষা প্রাপ্ত হয় ও Practical অর্থাৎ তাহারা কার্য্যকরী শিক্ষা প্রাপ্ত হয়—অর্থাৎ যাহা চলিত কথায় বলে 'পুথিগত বিদ্যা' তাহা নহে। আমাদের দেশের শিক্ষার সহিত মার্কিণদেশের শিক্ষার অনেক বিভিন্নতা আছে। সেখানে নারীদের যাহা সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজনীয়, সেই বিষয়গুলি বিশেষরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়, যথা child-nature,millinery (টুপি জরী প্রভৃতি পরিচ্ছদের কাজ),domestic science (গার্হস্থ্য বিজ্ঞান), laundry (কাপড় ধোলাই ও ইস্ত্রির কাজ), cooking, hygiene (স্বাস্থ্য বিজ্ঞান)—অর্থাৎ যাহা শিক্ষা করিলে ভবিষ্যতে তাঁহারা সুগৃহিণী হইতে পারেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই সকল শিক্ষা প্রদত্ত হয়। এই সকল বিষয়ে নিয়মিত পরীক্ষা লওয়া হইয়া থাকে। এগুলি compulsory subjects বলিলেও চলে। এই বিষয়গুলিতে কৃতকার্য্য হইলে অন্যান্য বিষয় যথা—ইংরাজি,ইতিহাস, গণিত,দর্শন-শাস্ত্র, বিজ্ঞান প্রভৃতি elective (নৈর্ব্বাচিক ভাবে) শিক্ষা করিতে পারেন।

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় co-educationalত নহেই, অথচ মার্কিণ

বিশ্ববিদ্যালয় যেগুলিকে compulsory subjects বলিয়া গণ্য করেন, সেগুলিও এদেশস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় না। যে সকল পিতামাতা কন্যাগণকে সুগৃহিণী করিবার জন্য এই সকল শিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য ও প্রয়োজনীয় বোধ করেন তাঁহারাই নিজের গৃহে অথবা অন্য কোন স্থানে শিক্ষা প্রাপ্ত হইবার ব্যবস্থা করেন, সুতরাং বঙ্গমহিলাগণ এ সকল বিষয়ে মার্কিন মহিলাদের সমকক্ষ হইতে পারেন না। তাহার কারণ পিতামাতার ঐ সকল বিষয়ে অনুৎসাহ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষাবিস্তারের অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিতে অবহেলা। কিন্তু আমরা সকলেই স্বীকার করিব যে,বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী আমাদের দেশের নারীগণকে সর্ব্ববিষয়ে সুদক্ষ ও উপযুক্ত হইতে দিতেছে না। পুরুষের সহিত যখন নারীর প্রকৃতিগত বিভিন্নতা রহিয়াছে,তখন শিক্ষা-প্রণালীরও কোন কোন বিষয়ে বিভিন্নতার আবশ্যক, নচেৎ নারীগণের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ অভাব দেখিতে পাওয়া যাইবে ও তাঁহাদের ভবিষ্যতে সুগৃহিণী না হইবারও আশঙ্কা থাকিবে। তাহার পর মার্কিণ দেশে সকল নারীই সাধারণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশে অতি অল্পসংখ্যক নারীই উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ব্রাহ্ম সমাজ ও খৃষ্টীয়ান্ সমাজ এ বিষয়ে উৎসাহী ও উদার। হিন্দুসমাজের ঘোর কুসংস্কারের মধ্যে নারীগণের শিক্ষালাভ করা অতি দুষ্কর ব্যাপার। হিন্দুসমাজের পিতামাতার বিশেষ লক্ষ্য এই যে, তাঁহাদের কন্যা যেন সুগৃহিণী বলিয়া শ্বশুরালয়ে সুখ্যাতি প্রাপ্ত হন, সুতরাং তাঁহারা অতি সামান্য বিদ্যাই লাভ করেন, তবে তাঁহারা সাংসারিক কার্য্যে সুনিপুণ হন। এক দিকে যেমন তাঁহাদের লাভ,অন্য দিকে তাঁহাদের মধ্যে অনেক অভাব দৃষ্ট হয়। প্রকৃত শিক্ষা,অর্থাৎ যে শিক্ষা বিদ্যা ও সাংসারিক জ্ঞান সমান ভাবে অর্জ্জন করিতে সাহায্য করে, উক্ত তিন সমাজের মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর হইয়াছে। এইটী আমাদের একটী বিশেষ অভাব বলিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে, ও যতদিন এ অভাব মোচন না হইবে, ততদিন আমাদের দেশের উন্নতি সুদূরপরাহত হইয়া রহিবে।

শিক্ষা যেমন নরনারীকে উন্নত ও উদার করে, সেইরূপ কোন কোন স্থানে আত্মম্ভরী ও অহঙ্কারী করে, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা এরূপ করে না। বিদ্যার অহঙ্কার একটী ভীষণ জিনিষ, অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিও ইহা বর্জ্জন করিতে অক্ষম হন। কিন্তু মার্কিণ মহিলাগণের আর একটী বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দ্বারা সম্মানিত হইয়া অহঙ্কারে স্ফীত হন না,— তাঁহাদের গৌরবান্বিত মস্তক, বিনয় ও নম্রতা দেখিতে অতীব মনোহর। নারীর মধ্যে অহঙ্কাররূপ কীট প্রবেশ করিলে তাঁহাদের রমণীয়তা অন্তর্হিত হয়। মার্কিণ-

মহিলাগণ যে অহঙ্কারী হইতে পারেন না, তাহার আর একটী বিশেষ কারণ এই যে, সে দেশে বহুসংখ্যক উপাধিধারি-মহিলা রহিয়াছেন, এই হেতু কেহই অহঙ্কারে স্ফীত হইতে সাহস পান না। আমাদের দেশেও যখন সকল নারী উপাধি প্রাপ্ত হইবেন, তখন এই অহঙ্কার-রূপ কীট—যাহা এখন কোন কোন স্থানে দৃষ্ট হয়, তাহা আর তাঁহাদের কমনীয়তা নষ্ট করিতে পারিবে না। উচ্চশিক্ষার একটী বিশেষ গুণ এই যে,নারীগণ তদ্দ্বারা আত্মনির্ভরশীল হইতে পারেন। আত্ম-নির্ভর নরনারী উভয়ের একটী শ্রেষ্ঠ গুণ, এই আত্মনির্ভরতা ভিন্ন জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। সে কারণ বঙ্গনারীর উচ্চশিক্ষা ভিন্ন বঙ্গদেশের উন্নতি কল্পনা করা বৃথা। এই উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া মার্কিণ মহিলাগণ স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কুমারী-অবস্থায় বা যখন বিবাহিতা হন,তখনও তাঁহারা অধ্যাপকের, শিক্ষয়িত্রীর, ডিমনষ্ট্রেটরের, সম্পাদকের ও যন্ত্রালয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তাহার দ্বারা তাঁহারা নিজেদের ও পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিয়া থাকেন। বঙ্গমহিলাগণ যেরূপ পরাধীন ভাবে অবস্থান করিতেছেন, মার্কিণ মহিলাগণ তাহার বিপরীত-ভাব লেন। শিক্ষিতা মাতা যেমন সন্তান-সন্ততির সুশিক্ষা ও মঙ্গলোন্নতির জন্য ব্যস্ত, অশিক্ষিতা মাতা তেমন নহেন,ইহা আমরা সচরাচর দেখিয়া থাকি। অনেকে বলিতে পারেন,এই উচ্চশিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে না লইয়া গৃহে উপযুক্ত শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর নিকট হইতে লইলেও চলিতে পারে,কিন্তু ইহা প্রকৃতপক্ষে সম্ভবপর নহে, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল ও কলেজের যে সুদৃঢ় নিয়মাবলী ও বাৎসরিক পরীক্ষা আছে তাহাই উচ্চশিক্ষার প্রধান সহায়। ইহা সর্ব্বদেশে পরীক্ষিত ও অনুকরণীয় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই উচ্চ-শিক্ষার জন্য প্রত্যেক নারীরই ইচ্ছা থাকা উচিত। আমেরিকার কোন্ কোন্ মহিলা উচ্চশিক্ষা পাইবার জন্য ব্যগ্র, তাহার তদন্তের ভার মিস্ কেলির উপর ছিল। তিনি তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছেন —"আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সকল মহিলা দেখিতে সুশ্রী নহেন, তাঁহারা জানেন যে তাঁহাদিগকে কেহ বিবাহ করিবেন না, সে কারণ তাঁহারা উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ইচ্ছুক। ভবিষ্যতে আত্ম-নির্ভরশীল হইয়া থাকাই তাঁহাদের এক-মাত্র উদ্দেশ্য।" ইহা আমাদের নিকট অনেকটা অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয়। উচ্চ-শিক্ষালাভ সম্বন্ধে সুন্দরী বা কুরূপার ভেদাভেদ নাই, উচ্চশিক্ষা সকলেরই জন্য। ইহা প্রত্যেক পুরুষ ও রমণীর ঈপ্সিত ধন।

এক্ষণে আমাদের বিবেচ্য—নারীগণ কাহাদের নিকট হইতে এই শিক্ষা পাই-বেন? শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর নিকট? মার্কিণদেশে ইহার ভেদাভেদ নাই, পুরুষের নিকট নারী শিক্ষালাভ করিতে-

ছেন ও নারীর নিকট পুরুষ শিক্ষালাভ করিতেছেন এবং এই প্রণালীতেও শুভ-ফল দেখা গিয়াছে। কিন্তু আমাদের বোধ হয় এ দেশের নারীর শিক্ষা নারীর নিকটই পাওয়া উচিত, কারণ আমাদের দেশের নারীগণ সাধারণতঃ লজ্জাশীল ও লজ্জাই নারীর ভূষণ, পুরুষের নিকট শিক্ষালাভ করিতে তাঁহারা সঙ্কোচ বোধ করেন ও সকল বিষয় উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন না। সে কারণ শিষ্যা ও শিক্ষয়িত্রীর সম্বন্ধের ব্যতিক্রম ঘটে। আমাদের দেশে আজ-কাল উচ্চশিক্ষিত-মহিলার অভাব নাই। প্রতিবৎসর বঙ্গমহিলার নাম graduate-দিগের ও master of arts-দিগের listকে শোভিত করিতেছে। এই সকল মহিলার মধ্যে যে সকলেই সংসার ধর্ম্ম করেন, তাহাও নহে। অথচ করিলেও কার্য্যের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে না। আমাদের শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃ-পক্ষগণ যদি মহিলাদিগের স্কুলে কেবল শিক্ষিত মহিলাগণকে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে উচ্চশিক্ষার উৎসাহ দেওয়া হয় ও তাহার শুভ ফলও ফলিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, নারীগণকে যদি জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য চেষ্টা করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের কোমল ভাবগুলি চলিয়া যায় ও তাঁহারা পুরুষের ন্যায় কঠোরপ্রাণ হন। ইহা কোন কোন স্থলে সত্য বটে, কারণ দেখা যায় কোন কোন শিক্ষয়িত্রী ও অন্য কোন কর্ম্মক্ষেত্রের নারীগণ বহুকাল কর্ম্ম করিয়া শেষে উদ্ধত-প্রকৃতি ও নিষ্ঠুরস্বভাব হন। ঈশ্বর নারী-গণকে কোমল বৃত্তিগুলি এমন সুন্দর ভাবে দিয়াছেন যে, ঐরূপ অস্বাভাবিক বৃত্তি বিশিষ্ট নারী অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। সেকারণ নারীগণের আত্ম-নির্ভরতার পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃজন করা বিধেয় নহে। শিক্ষয়িত্রীর পদ যেরূপ মাননীয়, সেইরূপ দায়িত্বপূর্ণ, এইজন্য তাঁহাকে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হয়। মার্কিণ দেশে অনেক শিক্ষিতমহিলা দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা আজীবন কুমারী থাকিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কার্য্য করিয়া বা অন্য কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, নারী-জাতির উন্নতিকল্পে প্রচুর অর্থ দান করিয়া ত্যাগের আদর্শ-স্থানীয় হইয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

বামারচনা।

বসন্ত-আগমনী।

দ্রুত পদে, ম্লান মুখে, কম্পিত হিয়ায়
কুয়াসা, হিমানী, ওই মাগিছে বিদায়।

মরি কি অপূর্ব্ব জ্যোতি
ছড়ায়ে রূপের ভাতি

নামিল বসন্ত ধীরে এ ভব ভবন,
ঢালিয়া মরত পুরে স্বর্গীয় কিরণ।
হে বসন্ত আনিয়াছ মৃতসঞ্জীবনী
তোমার পরশে ওই জাগিছে অবনী।
তরুণ মধুর হাসি,
আনন্দে উঠেছে ভাসি
আলোময়, দীপ্তিময়, ভরিয়াছে দেশ,
সাজিয়াছে বসুন্ধরা পরি নব বেশ।
ললিত সৌন্দর্য্যে মরি ভুবন ভরিয়া
সোণার বসন্ত তুমি এসেছ নামিয়া।
আপনি মা বসুমতী
রাখিয়াছেন কোল পাতি,
তারি পুণ্যফলে তব আগমন ভবে
তোমাকে মাখান সেই স্বর্গীয় সৌরভে।
ফল, পুষ্প, বৃক্ষ, যত তোমার কৃপায়
ধরিয়াছে চারু কান্তি নবীন পাতায়।
কুসুমে ভরিয়া ডালা
গাঁথিয়া প্রেমের মালা
পরে ঐ নব ভূষা শ্যামল বসন,
প্রকৃতি তোমারে যেন করিছে বরণ।
মৃদু মন্দ গন্ধ লয়ে মলয় পবন
তব পদে উপহার করিছে অর্পণ।
মধুর মৃদুল বায়
কোকিলা পাগিয়া গায়
গুঞ্জরিছে মধুকর ফুলে ফুলে বসে
তোমারে আহ্বানে যেন সুমধুর ভাষে।
মধুর বসন্ত তুমি বড় সুধাময়
প্রেম-প্রীতি-ভরা তব প্রফুল্ল হৃদয়।
হেরিলে তোমারি মুখ
আনন্দে উথলে বুক
তোমার পরশে যেন আবার সংসার
আসিয়াছে নিয়ে নব শুভ সমাচার।
মরি কি মধুর রূপে ভরেছে ভুবন
যখন যে দিকে চাই জুড়ায় নয়ন।
নদ নদী আদি যত
নব ভাবে বিকশিত,
মৃদুল লহরী তুলি মৃদু মৃদু বায়
অমৃত উচ্ছ্বাসে মরি বিশ্ব ভেসে যায়।
চারু হাসি ধরি চাঁদ শোভিছে গগন
তোমার সৌন্দর্য্যে দেখ হাসায় ভুবন,
সন্ধ্যা দেবী, উষারাণী
তব প্রেমে সুহাসিনী
দিগন্ত উজল করি নবীন আভায়
মন প্রাণ ঢেলে যেন তোমাতে মিশায়।
দিবাকর উঠে যবে সোণালী ছটায়
সুবিমল হাসি নিয়ে জগত মাতায়
তোমার সুন্দরতায়
উছলি উছলি ধায়।
মরি কি আশ্চর্য্য শোভা কিবা মনোহর
উঠে পড়ে কত তায় সৌন্দর্য্য লহর।
সুশোভিত করে তাই এ ভব ভবন
করিয়াছ পুলকিত মানবের মন।
তুমিই মানব-প্রাণে
নব নব সুধা-দানে
ভরিয়াছ নব ভাবে কি স্নেহ ধরায়
গড়িয়াছ ভব ধরা স্বর্গীয় শোভায়।
(অথবা)
সাজাতে ফুলের মালা হাসাতে কানন
স্বরগের দেব তুমি মরতে এখন
ছাড়ি এ সৌন্দর্য্য-রাশি
নিবায়ে মধুর হাসি
চলে যাবে অবশেষে স্বরগ-ভবন

পাঠাবে পোড়াতে বিশ্ব গ্রীষ্মের তপন।
চাই না গ্রীষ্মের রবি, শরতের শশী
বসন্ত! তোমায় তাই বড় ভালবাসি,
ছাড়িয়া অমরভূমি,
ধরাতলে থাক তুমি,
মানব হৃদয়ে নিতি জাগে ও বাসনা
মধুর বসন্ত তুমি যেও না যেও না।

শ্রীমনোরমা রায়।

বসন্তে।

ওহে ঋতুরাজ! কেন এলে আজ,
কোথা ছিলে সঙ্গোপন?
ডেকে ডেকে পাখী ভাঙ্গিয়াছ গলা
পায় নাই তবু দরশন।
বিকশি প্রসূন গিয়াছে ঝরিয়া
নীরবেতে করি অভিমান,
গভীর নিশায় কাঁদিয়া প্রকৃতি
করে সিক্ত বিশ্ব উপাধান।
তবু ও তোমার গলেনি হৃদয়,
নিরদয় তুমি কি ভীষণ,
নব বেশে সাজি নব ভাব লয়ে
কেন আজি বল আগমন?
সাধের প্রেয়সী পিকরাণী বিনে
শোন না কি কারো আবাহন?
এত ডাকাডাকি, এত অনুরোধ,
তাই কি র হেলা অনুক্ষণ?
প্রাণ খুলি পিক ডাকিবার আগে
ফুরাবার আগে তার গান,
বিরহ স্মরিয়া মিলনের তরে
উঠিল কি কেঁদে তব প্রাণ?
তাই আজি আর নারিলে রহিতে
সফল তারি মধুর তান।
এস ঋতুরাজ! গুপ্ত স্তব-কোষ
তোমারে করিতে আজি দান।
তোমারে লভিয়া ভুলেছে প্রকৃতি
মরমবেদনা আজি সব,
ভুবন ভরিয়া আহা কি মাধুরী
চারি দিকে কিবা হর্ষ-রব!
কাননে কাননে ফুলরাণী আজি
প্রেমভরে করে গলাগলি,
লাজ আবরণ কারো পড়ে খসি
আধেক ঘোমটা কেহ তুলি।
মিলন বারতা মলয়-পবন
দুয়ারে দুয়ারে করে দান,
পিকরাণী-তানে মিশায়ে সুস্বর
বিহঙ্গম করে সুধা গান।
প্রকৃতির যত ঘুচেছে অভাব
তোমারে লইয়া আজি ভোর,
চির মধুময়ে মানসে জাগিয়া
কৃতজ্ঞতা অশ্রু বহে মোর।

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।

"প্রার্থনা"।—

ওহে প্রভু দয়াময়,
জগতের পতি,
অপার করুণা তব
আমাদের প্রতি।
মোরা অতি দীনহীন
তোমার সন্তান
অজস্র করুণা তবু
করিছ প্রদান।—
মোরা অতি অল্পমতি
পাপেতে মলিন,
কেমনে বর্ণিব তোমা,
নাহি কোন জ্ঞান।
অখিল-ব্রহ্মাণ্ডপতি,
করুণা-নিধান
অনন্ত তোমার লীলা
অসীম ভুবান্।—
এ জগতে প্রলোভনে,
পড়িয়া নিয়ত
করিতেছি কত পাপ
আমরা সতত।—
আমরা যে গো তোমার
দুর্ব্বল সন্তান,
নহে তব অবিদিত
ওহে ভগবান্।

মোরা নাহি জানি ধ্যান
অথবা ভজন,
কেমনে করিব তবে
ও গুণ কীর্ত্তন।
ভাই ভগ্নী পিতা মাতা
বন্ধু সহচর,
না চাহিতে সব তুমি
দিয়েছ মোদের।
এই ভিক্ষা মাগি আজি
করি এ মিনতি
নিত্য সত্য ব্রতে তব
কর মোরে ব্রতী।
তব বলে মোরা যেন
হয়ে বলীয়ান্
তোমারি পবিত্র পথে
হই আগুয়ান।
তোমারি দয়াল নামে
করিয়ে নির্ভর
বাধা বিঘ্ন দূরে ফেলি
হই অগ্রসর।
এই আশীর্ব্বাদ কর
মোদের উপর
ভক্তিভরে ও চরণে
করি নমস্কার।

---

৩৭ নং মথুরার লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।